ইসলাম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান
মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন
মুহাম্মদ আবদুল মালেক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ড. মোহাম্মদ ইউছুফ
মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ
ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ধর্মীয় শিক্ষাকে জীবনঘনিষ্ঠ করতে এবং শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে নিজ ধর্মের মৌলিক রীতিসমূহের পরিচিতি প্রদান জরুরি। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটিয়ে ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সপ্তম শ্রেণির জন্য **ইসলাম শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরিবার, সমাজ, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় সেসব দিক বিবেচনায় রেখে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	আকাইদ	১–২৪
দ্বিতীয়	ইবাদত	২৫–৫০
তৃতীয়	কুরআন ও হাদিস শিক্ষা	৫১–৮২
চতুর্থ	আখলাক	৮৩–১০৩
পঞ্চম	আদর্শ জীবনচরিত	১০৪–১১৯

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ)

আকাইদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো আকিদাহ। আকিদাহ অর্থ বিশ্বাস। আর আকাইদ শব্দের অর্থ বিশ্বাসমালা। ইসলামের সর্বপ্রথম বিষয় হলো আকাইদ। ইসলামের মূল বিষয়গুলোর উপর মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকেই আকাইদ বলা হয়। আকাইদের সবগুলো বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, তাকদির ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম আকাইদ। যে এসব বিষয়ে বিশ্বাস করে, সে-ই ইসলামে প্রবেশকারী বা মুসলিম।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- তাওহিদের স্বরূপ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কুফরের পরিচয়, কুফল ও পরিণতি বর্ণনা করতে পারব।
- শিরকের পরিচয়, কুফল ও পরিণতি বর্ণনা করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে কুফর ও শিরক পরিহার করার উপায়সমূহ বলতে পারব।
- ইমান মুফাস্সাল (ইমানের বিস্তারিত পরিচয়) অর্থসহ শুদ্ধভাবে পড়তে, বলতে এবং এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আল্লাহর কয়েকটি গুণবাচক নাম ও এসবের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আল্লাহর গুণবাচক নাম সম্পর্কিত গুণসমূহ নিজ আচরণে প্রতিফলনের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- রিসালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ওহির পরিচয় ও এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব এবং সিরাত ও মিযানের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
- আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে নৈতিক জীবনযাপনের উপায় বলতে পারব।
- নৈতিক জীবনযাপনে তাওহিদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১

তাওহিদ (اَلتَّوْحِيْدُ)

তাওহিদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। মহান আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করার নামই হলো তাওহিদ। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক। তার কোনো শরিক নেই। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনিই আমাদের রক্ষক, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিজিকদাতা। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তার সমকক্ষ বা সমতুল্য কিছুই নেই। তিনিই একমাত্র মাবুদ। সকল প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তারই প্রাপ্য। মনে প্রাণে এরূপ বিশ্বাস করাকেই তাওহিদ বলা হয়।

তাওহিদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আকাইদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ ইমান ও ইসলামে প্রবেশ করে। তাওহিদে বা একত্ববাদে বিশ্বাসের পর আকাইদের অন্যান্য বিষয় বিশ্বাস করতে হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দুনিয়াতে অনেক নবি-রাসুল আগমন করেছেন। তাঁরা সকলেই তাওহিদের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। তাঁদের সকলের দাওয়াতের মূল বাণী ছিল 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই'। এমন কোনো নবি ছিলেন না যিনি তাওহিদের কথা বলেন নি। বরং সকল নবি-রাসুলই তাওহিদের শিক্ষা প্রচার করেছেন। ইসলামের সকল বিধি-বিধান তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাওহিদের পরিপন্থী কোনো বিধান ইসলামে নেই। সালাত, যাকাত, সাওম, হজ- সকল ইবাদতই এক আল্লাহর জন্য করতে হয়। কোনো কিছু চাইতে হলেও এক আল্লাহর নিকট চাইতে হয়। এটাই ইসলামের শিক্ষা। অতএব, ইসলামে তাওহিদের গুরুত্ব অপরিসীম।

তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে সফলতা এনে দেয়। কেননা তাওহিদ মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দান করে। মানুষ আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও গুণাবলি জানতে পারে। দুনিয়ার কাজকর্মের জন্য মানুষকে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে-এ শিক্ষা তাওহিদের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। এ শিক্ষার দ্বারা মানুষ অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকলে এর ফলে সে আখিরাতে সফলতা লাভ করবে। দুনিয়ার জীবনেও তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাওহিদে বিশ্বাসীগণ শুধু আল্লাহ তায়ালার সামনে মাথা নত করে। অন্য কারো সামনে সে মাথা নত করে না। পক্ষান্তরে, তাওহিদে বিশ্বাস না করলে মানুষ বিপথগামী হয়ে যায়। সে গাছপালা, পশু-পাখি, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির নিকট মাথা নত করে। নানা মূর্তির পূজা করতে থাকে। ফলে মানুষের আত্মমর্যাদা বিনষ্ট হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মসচেতনতা জাগিয়ে তোলে।

তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস মানুষকে এক জাতিত্ব বোধ এনে দেয়। ফলে মানুষ পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়। পক্ষন্তরে, শিরক বা বহু উপাস্যের বিশ্বাস মানুষকে বহুদল ও গোষ্ঠিতে বিভক্ত করে দেয়। এক মানবজাতির বিভাজন পরিণতিতে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও হানাহানির কারণ হয়। এতে শান্তি ও মানবতা বিপর্যস্ত হয়। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে এক আল্লাহ তায়ালার প্রতি নির্ভরশীল করে। ফলে বিপদে-

আপদে, দুঃখ-কষ্টে মানুষ হতাশ বা নিরাশ হয় না বরং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে পূর্ণোদ্যমে কাজ করতে থাকে এবং সাফল্য লাভ করে। এভাবে তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি ও সফলতার দুয়ার খুলে দেয়।

কতো বিশাল এ বিশ্বজগৎ! আমাদের পৃথিবী এর সামান্য অংশমাত্র। বড় বড় গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা, গ্যালাক্সি এ বিশ্বজগতে বিরাজমান। এগুলোর প্রত্যেকটিই সুশৃঙ্খলভাবে ঘুরছে। কোনোটি এর নির্ধারিত নিয়মের বাইরে যাচ্ছে না।

কে দিলেন এই নিয়ম? আমাদের পৃথিবী কতো সুন্দর। এতে রয়েছে বিশাল আকাশ, বিস্তৃত মাঠ, বড় বড় পাহাড়-পর্বত, প্রবাহমান নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর। এ সবকিছুই আপনা আপনি সৃষ্টি হয় নি। কে এসবের সৃষ্টিকর্তা?

প্রাকৃতিক দৃশ্য

ফল খেতে আমরা সবাই ভালোবাসি। আমগাছে আম হয়, জামগাছে জাম। আমরা কি কখনো কাঁঠাল গাছে আম কিংবা তরমুজ ধরতে দেখেছি? কেউই দেখিনি। কারণ কাঁঠালগাছে কাঁঠাল ছাড়া অন্যকোনো ফল হয় না। আমাদের চারপাশে রয়েছে নানারকম পশু-পাখি। কাক আমাদের অতিপরিচিত পাখি। কাক সবসময় কা কা করেই ডাকে। কাক কোনো দিন কোকিলের মতো ডাকে না। আবার গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল সবাই নিজ নিজ স্বরেই ডাকাডাকি করে। আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি কেন এমন হয়? কেন এক পশু আরেক পশুর স্বরে ডাকে না? গাছের ফল-ফসল, পশু-পাখির আচার-ব্যবহার- এসব কে নিয়ন্ত্রণ করেন?

বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই এই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা। মহাজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা তারই দান। পৃথিবীর সকল কিছুর স্রষ্টাও তিনিই। আর পশু-পাখি, গাছপালাসহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রকও তিনি। তিনিই সবকিছু করেন। বরং তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়। এসব কিছুতে যদি একের বেশি নিয়ন্তা থাকত, তবে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج

অর্থ : 'যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ২২)

একটু চিন্তা করলেই আমরা বিষয়টি বুঝতে পারব। যেমন মহাজগতের সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা যদি একাধিক হতেন, তাহলে মহাজগৎ এত সুশৃঙ্খলভাবে চলত না। একজন স্রষ্টা চাইতেন সূর্য পূর্ব দিকে উঠুক। আরেকজন চাইতেন পশ্চিম দিকে। আবার অন্যজন দক্ষিণ বা উত্তর দিকে সূর্যকে উদিত করতে চাইতেন। ফলে এক চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

এমনিভাবে আমগাছে আম না হয়ে কোনো কোনো সময় কাঁঠাল, জাম ইত্যাদিও হতে পারত। এতে আমরা বেশ অসুবিধায় পড়তাম। বস্তুত একাধিক স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রক থাকলে বিশ্বজগতের সুন্দর সুশৃঙ্খল অবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেত। আল-কুরআনের অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ

অর্থ : "আর তার (আল্লাহর) সাথে কোনো ইলাহ নেই। যদি তা থাকত, তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত।" (সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত ৯১)

এ আয়াতেও তাওহিদ বা একত্ববাদের তাৎপর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নিচের উদাহরণের মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে পারি। একাধিক স্রষ্টা থাকলে তারা তাঁদের সৃষ্টিকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতেন। যেমন আগুনের স্রষ্টা আগুন নিয়ে পৃথক হয়ে পড়তেন। অতঃপর সমস্ত কিছুকে আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দিয়ে তার নিজ ক্ষমতার প্রকাশ করতেন। তেমনি মহাসাগরের স্রষ্টা সারা পৃথিবী তার সৃষ্টি দ্বারা ডুবিয়ে দিতে চাইতেন। এভাবে স্রষ্টাগণ নিজ নিজ সৃষ্টি দ্বারা অন্যের উপর বিজয়ী হতে চাইতেন। ফলে আমাদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত। পৃথিবীর সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যেত।

এসব বর্ণনা এ কথাই প্রমাণ করে যে ইলাহ মাত্র একজনই। আর তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পালনকর্তা। তার হুকুম ও নিয়মেই সবকিছু পরিচালিত হয়। কোনো সৃষ্টিই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারে না। এসব কাজে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। আন্তরিকভাবে এরূপ বিশ্বাসের নামই তাওহিদ বা একত্ববাদ।

আমরা তাওহিদের পরিচয় জানব। এতে বিশ্বাস স্থাপন করব। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে প্রকৃত ইমানদার হবো।

একক কাজ : তাওহিদের তাৎপর্য লিখবে এবং প্রত্যেকে তার পাশের বন্ধুকে দেখাবে।
বাড়ির কাজ : তাওহিদে বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তির জীবন ও কর্মে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ২
তাওহিদ ও নৈতিকতা

তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহ তায়ালা তার সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয়-এ বিশ্বাসকে তাওহিদ বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ

অর্থ : "(হে নবি!) বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।" (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত ০১)

আর নৈতিকতা হলো উত্তম নীতির অনুসরণ। অর্থাৎ কথাবার্তা, আচার-আচরণে উত্তম আদর্শ ও নীতির অনুসরণ করাকেই নৈতিকতা বলা হয়। তাওহিদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তাওহিদের শিক্ষা মানুষকে ইসলামী নৈতিকতার দিকে পরিচালনা করে। যে ব্যক্তি তাওহিদে বিশ্বাসী, সে ইসলামী নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা। তিনি আমাদের উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালনপালন করেন। পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত তারই দান। তিনি আমাদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমাদের সৃষ্টি করার মূল কারণ হলো তার ইবাদত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

অর্থ : "আমি জিন এবং মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

সুতরাং মানুষের উচিত তার ইবাদত করা, শুকরিয়া আদায় করা। জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রে তার হুকুম ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। অতএব, তাওহিদে বিশ্বাস আমাদের আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভালো ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করে। এভাবে নৈতিকতা অর্জনে তাওহিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তাওহিদের মূল শিক্ষা হলো আল্লাহ তায়ালাকে একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করা। পাশাপাশি আল্লাহ তার গুণাবলিতেও একক-এ বিশ্বাসও তাওহিদের অন্তর্গত। তাওহিদ আমাদের আল্লাহ তায়ালার নানা গুণের পরিচয় দান করে। যেমন- আল্লাহ তায়ালা রাহমান, রাহিম, করিম, গাফফার, রাযযাক, খালিক, মালিক, রব ইত্যাদি। এ সমস্ত গুণের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা একক। কেউই তার সমকক্ষ নয়। তিনি সকল গুণে অতুলনীয়। কোনো মানুষ বা সৃষ্টির পক্ষে তার এসব গুণের পূর্ণ অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। তবে মানুষ নিজ জীবনে এসব গুণের চর্চা করবে। উত্তম চরিত্রবান হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ নৈতিকতার সর্বোত্তম স্তর। মানুষ যখন এসব গুণাবলি অনুশীলন করে, তখন তার সকল কাজ নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী হয়। তার দ্বারা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে তাওহিদ মানুষকে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি অর্জন করতে উৎসাহিত করে।

অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালার অন্যতম গুণ হলো শান্তিদাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু জানেন, সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি একমাত্র মালিক ও মহাবিচারক। এসব গুণ মানুষকে নীতি ও আদর্শ মেনে চলতে সাহায্য করে। এগুলোতে বিশ্বাস করলে মানুষ কোনো অন্যায় ও দুর্নীতি করতে পারে না। কারণ সে জানে, আল্লাহ তায়ালা তার সকল কাজ দেখছেন। তিনি এগুলোর হিসাব নেবেন। অতঃপর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেবেন। এভাবেও তাওহিদের শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

তাওহিদ মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল করে তোলে। তাওহিদে বিশ্বাসীগণ শুধু আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করেন। আল্লাহ তায়ালাকেই ইলাহ বা প্রভু হিসেবে স্বীকার করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

অর্থ : "তিনিই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

সুতরাং তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সৃষ্টির নিকট মাথা নত করে না। কারো আনুগত্য করে না। বরং মানুষ হিসেবে নিজ মর্যাদা রক্ষায় সচেতন থাকে। অপরদিকে অবিশ্বাসীরা সকল কিছুর নিকট ভরসা করে, মাথা নত করে। এটা মানবিক আদর্শের বিপরীত। ফলে দেখা যায় যে মানুষ তাওহিদে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানবিক গুণ ও মর্যাদা লাভ করে। তাওহিদ মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

আমরা জানতে পারলাম যে, তাওহিদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাওহিদ নানাভাবে মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। যুগে যুগে তাওহিদে বিশ্বাসী মানুষগণ ছিলেন নৈতিকতার উত্তম আদর্শস্বরূপ।

আমরাও তাওহিদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করব। অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতি করব না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির অনুশীলন করব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর খুশি হবেন। আমাদের জীবন সুন্দর ও শান্তিময় হবে।

দলগত কাজ : 'শুধু তাওহিদে অটল বিশ্বাস মানুষকে বলিষ্ঠ ও নৈতিক চরিত্র উপহার দিতে পারে।' শ্রেণিতে বিষয়টি দলগতভাবে আলোচনা করে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপনা করবে।

পাঠ ৩

কুফর (اَلْكُفْرُ)

কুফর আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, গোপন করা, ঢেকে রাখা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালা ও ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাস করাকে কুফর বলে। যে ব্যক্তি কুফরে লিপ্ত হয়, তাকে বলা হয় কাফির (كَافِرٌ)।

কুফর হলো ইমানের বিপরীত। কুফরের নানা দিক রয়েছে। যেমন:

ক. আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করা।

খ. ইমানের অন্যান্য মৌলিক বিষয়কেও অস্বীকার করা। যথা: নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল, তাকদির, পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদিকে অবিশ্বাস করাও কুফর।

গ. ইসলামের ফরজ ইবাদতগুলোকে অস্বীকার করাও কুফর। যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম, হজ ইত্যাদি ইবাদতগুলো অস্বীকার করা।

ঘ. হালাল জিনিসকে হারাম বলে বিশ্বাস করাও কুফর। তেমনি হারাম বস্তুকে হালাল বলে বিশ্বাস করাও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- কেউ যদি মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদিকে হালাল মনে করে, তবে সেও কুফরি করে।

কুফরের কুফল ও পরিণতি

কুফরের কুফল ও পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি নৈতিকতা ও মানবিক আদর্শের বিপরীত। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্রষ্টা। তিনিই আমাদের রিজিকদাতা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। সুতরাং তাঁকে অবিশ্বাস করা কিংবা তাঁর বিধান অস্বীকার করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। এটি চরম অকৃতজ্ঞতার শামিল। এর মাধ্যমে দয়াময় আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহ প্রকাশ করা হয়। তাই কাফিরদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আখিরাতে কাফিরদের স্থান হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾

অর্থ : "আর যারা কুফরি করে এবং আমার নিদর্শনগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৯)

কুফরির শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। অবশ্য কাফির ব্যক্তি যদি পুনরায় ইমান আনে এবং ইসলামের সমস্ত মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে সে এ শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। সাথে সাথে তাকে অবশ্যই পূর্ববর্তী কুফরি কাজের জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত হতে হবে এবং খাঁটি মনে তওবা করতে হবে।

অতএব, আমরা কুফর ও এর কুফল সম্পর্কে জেনে এ থেকে বেঁচে থাকব। এজন্য সর্বদা সতর্ক থাকব। আল্লাহ তায়ালার নিকট কুফর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা দুই দলে ভাগ হবে। একদল কুফরের পরিচয় বর্ণনা করবে। অপর দল কুফরের কুফল ও পরিণতি বর্ণনা করবে।

পাঠ ৪

শিরক (اَلشِّرْكُ)

শিরক শব্দের অর্থ অংশীদার সাব্যস্ত করা, সমকক্ষ মনে করা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে। অপর কোনো কিছুকে আল্লাহ তায়ালার সমতুল্য বা সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করাও শিরক। যে ব্যক্তি শিরক করে, তাকে বলা হয় মুশরিক (مُشْرِكٌ)।

তাওহিদের বিপরীত হলো শিরক। তাওহিদ হলো একত্ববাদ। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়- এরূপ বিশ্বাসকে তাওহিদ বলে। পক্ষান্তরে, শিরক হলো আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। কিংবা কাউকে আল্লাহর সমপর্যায়ের মনে করা। শিরক প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

ক. আল্লাহ তায়ালার সত্তার সাথে শিরক করা। যেমন- আল্লাহ তায়ালার পিতা, পুত্র কিংবা স্ত্রী আছে– এরূপ বিশ্বাস রাখা।

খ. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিতে অংশীদার সাব্যস্ত করা। যেমন- সৃষ্টিকর্তা একজন না মেনে একাধিক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি, জীবিকা, জীবন, মৃত্যু ইত্যাদির মালিক মনে করা।

গ. আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে শিরক করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত না করে অন্য কারো ইবাদত করা। যেমন-অগ্নিপূজা ও মূর্তিপূজা করা।

শিরকের কুফল ও পরিণতি

আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে শিরক। পৃথিবীতে যত প্রকার যুলুম আছে শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম বা পাপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ○

অর্থ : "নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম।" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৩)

শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যায় আচরণ করে। কেননা আল্লাহ তায়ালাই মানুষের একমাত্র স্রষ্টা। সকল ইবাদত ও প্রশংসা লাভের হকদারও তিনিই। শিরকের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত করে। ফলে আল্লাহর সাথে চরম অন্যায় করা হয়।

অন্যদিকে শিরক মানুষের মর্যাদাহানিকর কর্মও বটে। কেননা মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ তায়ালা সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ মুশরিকরা শিরকে লিপ্ত হয়ে অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে। ফলে মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। এজন্যই কুরআন মজিদে শিরককে সবচেয়ে বড় যুলুম বলা হয়েছে।

শিরকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তায়ালা শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। তিনি বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্য যেকোনো পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৬)

আমরা শিরক ও এর কুফল সম্পর্কে ভালোভাবে জানব এবং সর্বদা এ জঘন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব। আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনদেরকে শিরকের কুফল ও শোচনীয় পরিণতির কথা বলে সতর্ক করব।

দলগত কাজ : কী কী কাজে শিরক হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রদর্শন কর।
বাড়ির কাজ : শিরক পরিহার করার উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

পাঠ ৫

ইমান মুফাস্সাল (اَلْإِيمَانُ الْمُفَصَّلُ)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

(উচ্চারণ: আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি, ওয়া কুতুবিহি, ওয়া রুসুলিহি, ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি, ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত।)

অর্থ : আমি ইমান আনলাম-

১. আল্লাহর প্রতি

২. তার ফেরেশতাগণের প্রতি

৩. তার কিতাবগুলোর প্রতি

৪. তার রাসুলগণের প্রতি

৫. আখিরাতের প্রতি

৬. তাকদিরের প্রতি, যার ভালো–মন্দ আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকেই হয় এবং

৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। আর মুফাসসাল অর্থ বিস্তারিত। ইমান মুফাস্সাল অর্থ বিস্তারিত বিশ্বাস। বিস্তারিতভাবে ইমানের বিষয়গুলোর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথকভাবে সবকটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি। উক্ত বাক্যে ইমানের সাতটি বিষয়ের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে এ সাতটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো–

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

ইমানের সর্বপ্রথম বিষয় হলো মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। পূর্বের শ্রেণিতে আমরা ইমান মুজমাল সম্পর্কে জেনেছি। সেখানে আল্লাহ তায়ালার প্রতি কিরূপ বিশ্বাস করতে হবে তা বলা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাসই ইমানের মূল। আমরা আল্লাহ তায়ালার তাওহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস করব। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক ও অতুলনীয়। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণ রয়েছে। তিনিই একমাত্র মাবুদ। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ-ই ইবাদতের যোগ্য নয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা নুরের তৈরি। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার যিকির ও তাসবিহ পাঠে রত থাকেন। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। আল্লাহ তায়ালার হুকুম ব্যতীত তারা কোনো কাজই করেন না।

আল্লাহর নির্দেশ পালনই তাঁদের একমাত্র কাজ। ফেরেশতাগণের মধ্যে চারজন রয়েছেন নেতৃস্থানীয়। তারা হলেন: (১) হযরত জিবরাইল (আ.), যিনি আল্লাহর বাণী নবি-রাসুলগণের নিকট পৌঁছে দিতেন। (২) হযরত মিকাইল (আ.), যিনি আল্লাহর হুকুমে মানুষ ও জীবজন্তুর জীবিকা বণ্টন কাজে নিয়োজিত আছেন। (৩) হযরত আযরাইল (আ.), যিনি মানুষ ও জিনদের মৃত্যু ঘটানো বা রুহ কবয করার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন। (৪) হযরত ইসরাফিল (আ.), যিনি শিঙ্গা নিয়ে আল্লাহর নির্দেশের জন্য প্রস্তুত আছেন। আল্লাহর আদেশ পাওয়া মাত্রই সিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন। এতে দুনিয়া ও এর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দ্বিতীয়বার ফুৎকারে আবার সবাই জীবন ফিরে পেয়ে আখিরাতের ময়দানে বিচারের জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। অন্য সব ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হুকুম পালনে রত আছেন।

৩. কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তায়ালা বহু আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলো সবই আল্লাহর কালাম বা বাণী। তিনি নবি-রাসুলগণের মাধ্যমে এ কিতাবগুলো মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন। এসব কিতাব মানবজাতির জন্য আলোস্বরূপ। এসবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন। এসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে।

২০২৫

৪. রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় দান করেছেন। সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা নিজ থেকে এসব করেননি। বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েই তাঁরা তাওহিদের বাণী প্রচার করতেন। তাঁদেরকে আল্লাহর প্রেরিত নবি ও রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয়। বরং আখিরাতের জীবনও রয়েছে। আখিরাত হলো পরকাল। মৃত্যুর পরপরই এ জীবনের শুরু। মানুষ সেখানে দুনিয়ার ভালো কাজের জন্য জান্নাত লাভ করবে এবং মন্দ কাজের জন্য জাহান্নাম পাবে। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসও ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৬. তকদিরের প্রতি বিশ্বাস

তকদিরকে আমরা ভাগ্য বা নিয়তি বলে থাকি। সবকিছুর তকদিরই আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তায়ালাই তকদিরের নিয়ন্ত্রক। তকদিরের ভালো-মন্দ যাই ঘটুক, সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তকদির একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। সুতরাং আমরা তকদিরে বিশ্বাস করব এবং ভালো ফল লাভের জন্য চেষ্টা করব।

৭. পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

মৃত্যু একটি অনিবার্য সত্য। সকল জীবিত প্রাণীকেই মরতে হবে। আবার এমন একসময় আসবে, যখন আল্লাহ তায়ালা সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন। পৃথিবীর কোনো কিছুই সেদিন অবশিষ্ট থাকবে না। কেবল আল্লাহ তায়ালাই থাকবেন। এরপর একসময় আল্লাহ তায়ালা পুনরায় সবাইকে জীবিত করবেন। মৃত্যুর পর পুনরায় এ জীবিত হওয়াকেই পুনরুত্থান বলে।

এ সময় সবাইকে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে এবং দুনিয়ার সকল কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপর্যুক্ত সাতটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এর যেকোনো একটির প্রতিও অবিশ্বাস করা যাবে না। এর কোনো একটিকেও অবিশ্বাস করলে মানুষ মুমিন হতে পারবে না। আমরা ইমান মুফাসসালে বর্ণিত সাতটি বিষয় সম্পর্কে জানব। এগুলোর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করব।

দলগত কাজ : ইমানের সাতটি মূল বিষয় দলগত আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।
বাড়ির কাজ : প্রত্যেকে ইমান মুফাসসাল অর্থসহ মুখস্থ করে আসবে এবং একে অপরকে শুনাবে।

পাঠ ৬

আল–আসমাউল হুসনা (اَلْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى)

পরিচয়

আসমা শব্দটি শব্দের অর্থ নামসমূহ। আর হুসনা শব্দের অর্থ সুন্দর। আর আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দর নামসমূহ। আল্লাহ্ তায়ালা সকল গুণের অধিকারী। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, দয়াবান, ক্ষমাশীল, শান্তিদাতা ও পরাক্রমশালী। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান। তিনিই মালিক। পবিত্র কুরআনে এসেছে-

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج

অর্থ : "কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়।" (সূরা আশ্-শূরা, আয়াত ১১)

আল্লাহ তায়ালা অতুলনীয়। তার সত্তা যেমন অনাদি ও অনন্ত, তার গুণাবলিও তেমনি অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহ তায়ালার এসব গুণ নানা শব্দে নানা উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়। এসব গুণের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এ নামগুলোকেই একত্রে আসমাউল হুসনা বলা হয়। এই পাঠে আমরা আল্লাহ তায়ালার কতিপয় গুণবাচক নামের পরিচয় লাভ করব।

প্রভাব

মানবজীবনে আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব অপরিসীম। কেননা এসব গুণবাচক নাম মানবজীবনে দুদিক থেকে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথমত: এসব নামের দ্বারা আমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে চিনতে পারি। তার ক্ষমতা ও গুণাবলির পরিচয় পাই। যেমন- রাহমান, রাহিম নাম দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ্ তায়ালা দয়াবান। গাফফার নাম দ্বারা বুঝি যে মহান আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল। সুতরাং পাপ করে ফেললে আমরা তার নিকট ক্ষমা চাই। তিনিই পারেন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করতে।

অন্যদিকে তিনিই হলেন জাব্বার (প্রবল), কাহ্হার (মহাপরাক্রান্ত)। এগুলো স্মরণ থাকলে আমরা কোনো পাপ কাজ করতে পারি না। কেননা আমরা বুঝতে পারি যে পাপ কাজ করলে তিনি আমাদের শাস্তি দেবেন।

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালাই রিজিকদাতা, নিয়ামতদাতা, করুণাময়। ফলে আমরা তার নিয়ামত উপভোগ করে তার শোকরিয়া আদায় করতে পারি।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তায়ালার কিছু গুণবাচক নাম আমাদেরকে উত্তম গুণাবলি অর্জনে উৎসাহিত করে।

যেমন: আল্লাহ পাক দয়ালু, আমরাও সকলের প্রতি দয়া করব, তিনি ন্যায়পরায়ণ, আমরাও সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হবো। তিনি রিজিকদাতা। আমরাও ক্ষুধার্তকে অন্ন দেবো। আল্লাহ তায়ালা পরম ধৈর্যশীল। আমরাও বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করব। এভাবে আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহ আমাদেরকে উত্তম চরিত্রবান হতে উৎসাহিত করে।

আল্লাহু হায়্যুন (اَللّٰهُ حَيٌّ)

হায়্যুন শব্দের অর্থ চিরঞ্জীব। যিনি চিরকাল ধরে জীবিত। আল্লাহু হায়্যুন অর্থ আল্লাহ চিরঞ্জীব। তিনি চিরকাল ধরে আছেন, থাকবেন। যখন কোনো কিছুই ছিল না, তখনও তিনি ছিলেন। আবার কিয়ামতে যখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনও তিনিই থাকবেন। তার কোনো ক্ষয় নেই, রোগ-শোক, দুঃখ-জরা, তন্দ্রা-নিদ্রা কিছুই নেই। কোনোরূপ ধ্বংস তাকে স্পর্শও করতে পারে না। তিনি সকল ক্ষয় ও ধ্বংস থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط

অর্থ : "তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক। তাকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৫)

আমরা আল্লাহ তায়ালার এ গুণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। সকল কাজকর্মে আমরা প্রাণবন্ত থাকব। অলসতা, নির্জীবতা পরিহার করব। ক্লান্তি, শ্রান্তি, তন্দ্রা, নিদ্রা ইত্যাদি যেন আমাদের কাজে কোনো প্রভাব না ফেলে সে চেষ্টা করব। তাহলে আমরা সফলতা লাভ করব।

আল্লাহু কায়্যুমুন (اَللّٰهُ قَيُّوْمٌ)

কায়্যুমুন শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী, চিরবিরাজমান, চিরবিদ্যমান, সবকিছুর ধারক সত্তা। ইসলামি পরিভাষায় সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান, তিনিই কাইয়্যুম। অন্য কথায় আপন সত্তার জন্য যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন অথচ সকল সত্তার ধারক, এরূপ সত্তাকে কাইয়্যুম বলা হয়। আল্লাহু কায়্যুমুন অর্থ আল্লাহ চিরস্থায়ী। তিনিই সবকিছুর ধারক। তিনি বিশ্ববিধাতা। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আসমান-জমিনের সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণাধীন।

আল্লাহ তায়ালা চিরবিরাজমান। তিনি সবসময় বিদ্যমান। তিনি অনাদি-অনন্ত। তিনি সবকিছু জানেন। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তারই নিয়ন্ত্রণে।

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং নিপুণভাবে পরিচালনা করেন। কিয়ামত পর্যন্ত সবকিছুর রক্ষক তিনিই। আখিরাতেও তিনিই একমাত্র নিয়ন্তক। তিনি ব্যতীত আর কোনো চিরবিরাজমান সত্তা নেই।

আল্লাহু আযিযুন (اَللّٰهُ عَزِيْزٌ)

আযিযুন শব্দের অর্থ মহাপরাক্রমশালী। আল্লাহ তায়ালাই সকল ক্ষমতার উৎস ও মালিক। তার ক্ষমতা অসীম। তার ক্ষমতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কেউ তার ক্ষমতার মোকাবিলা করতে পারে না। আল-কুরআনে এসেছে–

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

অর্থ : "আল্লাহ পরমপরাক্রমশালী, দণ্ডদানকারী।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৪)

আল্লাহ তায়ালা অসীম ক্ষমতাধর। কেউ তাকে অপারগ করতে পারে না। তার সাথে ধোঁকা-প্রতারণা করতে পারে না। কেউ তার কৌশল বা পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে পারে না। তিনি যা চান তা-ই হয়। তার কুদরত বা ক্ষমতার মোকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে পারেন। দুনিয়ার বড় বড় ক্ষমতাবানদের তিনি ক্ষুদ্র প্রাণী বা বস্তু দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। যেমন তিনি ফেরাউনকে পানি দ্বারা, নমরূদকে মশা দ্বারা, আবরাহাকে ছোট ছোট পাখি দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাকে অস্বীকারকারী কেউই তার আযাব বা শাস্তি থেকে বাঁচতে পারেনি। ভবিষ্যতেও পারবে না।

আমরা সদাসর্বদা আল্লাহ তায়ালার এসব গুণের কথা মনে রাখব, এ গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করব। তাহলে সৎকাজ করা আমাদের জন্য সহজতর হবে।

আল্লাহু খাবিরুন (اَللّٰهُ خَبِيْرٌ)

খাবিরুন অর্থ সম্যক অবহিত। আল্লাহু খাবিরুন অর্থ আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সম্যক অবহিত, সবকিছু জানেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সকল খবর রাখেন।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩)

আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন। তিনি সকল বিষয়েই সম্যক অবহিত। কোনো কিছুই তার নিকট অজানা নয়। আমরা যা বলি বা করি সবই তিনি জানেন। এমনকি আমরা যেসব বিষয়ের কল্পনা করি, তাও তার অজানা নয়। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তু বা প্রাণীর খবরও তিনি জানেন। গভীর সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর খবরও তার জানা। অন্ধকার রাতে কালো পাথরের উপর কালো পিপীলিকার চলাফেরাও তার অজানা নয়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার মতো খালি চোখে যেসব প্রাণী দেখা যায় না, সে সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবহিত। এককথায় আসমান-জমিন ও এ বিশ্বজগতের এমন কোনো জিনিস নেই যা তার জ্ঞানের বাইরে। তিনি সবকিছু জানেন।

আমরা আল্লাহ তায়ালার এ গুণের তাৎপর্য উপলব্ধি করব। সবসময় মনে রাখব যে তিনি আমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে জানেন। আমাদের সব পাপপুণ্য কিছুই তাঁর অজানা নয়। আমরা অন্যায় থেকে বিরত থাকব এবং তার ভালোবাসা অর্জন করব।

আল্লাহু সাবুরুন (اَللّٰهُ صَبُوْرٌ)

সাবুরুন শব্দের অর্থ পরমধৈর্যশীল। আল্লাহু সাবুরুন অর্থ আল্লাহ পরমধৈর্যশীল। আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল। তার ধৈর্যের কোনো সীমা নেই।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে নানা নিয়ামত দান করেছেন। তিনিই মানুষকে রিজিক দেন, লালনপালন করেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় খাদ্য-পানীয় দেন। ভয়-ভীতিতে নিরাপত্তা দান করেন। আলো, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, পানি সবকিছু তারই দান। সুন্দর এ পৃথিবীর সবকিছুই তিনি মানুষের কল্যাণে দান করেছেন।

এতকিছুর পরও অনেক মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে না। তার অবাধ্য হয়। তার ইবাদত ছেড়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা এসব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেন। তিনি মানুষকে নিয়ামত দান বন্ধ করে দেন না। অবাধ্য হলে তিনি যদি আলো বা পানি বন্ধ করে দিতেন, তাহলে সকলে ধ্বংস হয়ে যেত। অবাধ্যতার জন্য তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিও দেন না। বরং তিনি সুযোগ দেন। মানুষ যদি তওবা করে ফিরে আসে, তবে তিনি ক্ষমা করে দেন। এরপর যদি মানুষ আবার পাপ করে তিনি পুনরায় ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেন। বান্দা যদি আবার তওবা করে তিনি পুনরায় ক্ষমা করেন। আল্লাহ ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। তিনি সর্বদা ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৩)

ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ

অর্থ : "তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৫৫)

আমরাও আল্লাহ তায়ালার এ গুণের অনুশীলন করব। অধীনদেরকে ক্ষমা করব। বিপদে-আপদে নিরাশ হবো না, বরং ধৈর্যধারণ করব।

দলগত কাজ : মানবজীবনে আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহের প্রভাব বর্ণনা কর।
বাড়ির কাজ : আল্লাহর তায়ালার পাঁচটি গুণবাচক নাম অর্থসহ লেখ।

পাঠ ৭

রিসালাত (اَلرِّسَالَةُ)

রিসালাত অর্থ বার্তা, সংবাদবহন, চিঠি, খবর পৌঁছানো ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার বাণী ও পরিচয় মানুষের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বকে রিসালাত বলে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই একমাত্র রিজিকদাতা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা। কিন্তু মানুষ নিজে থেকে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করতে পারে না। বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে মানুষ বুঝতে পারে যে এ মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। কিন্তু তিনি কে, তার গুণাবলি কীরূপ, তার ক্ষমতা কতো - এসব কিছুই মানুষ নিজে নিজে জানতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন পথপ্রদর্শ কর। আল্লাহ তায়ালা নিজেই মানুষের মধ্য থেকে এসব পথপ্রদর্শক নিয়োগ করেছেন। তারা মানুষের নিকট আল্লাহ তায়ালার সঠিক পরিচয় তুলে ধরার দায়িত্ব পালন

করেছেন। তাঁরা তাওহিদ ও আখিরাত সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী ও আদেশ-নিষেধ মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। এসব দায়িত্বকেই এক কথায় রিসালাত বলা হয়। যাঁরা এসব দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা হলেন নবি কিংবা রাসুল। সৎপথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ সকল জাতির নিকট নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا

অর্থ : "এবং নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি।" (সুরা আন-নাহল, আয়াত ৩৬)

নবি-রাসুলগণ আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দা। তাঁরা পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁরা সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রিসালাতে বিশ্বাস করা ইমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাওহিদে বিশ্বাস করার সাথে সাথে আমাদের রিসালাতেও বিশ্বাস করতে হবে। কেননা রিসালাতে বিশ্বাস না করলে মুমিন হওয়া যায় না।

নবি-রাসুলগণ রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ তায়ালা ও মানবজাতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ তায়ালার সঠিক পরিচয় পাই। তাঁরাই আমাদের নিকট মহান আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রিসালাত ও নবি-রাসুলগণের উপর বিশ্বাস করা অপরিহার্য। তাঁদেরকে অস্বীকার করলে ইমানের সকল বিষয়ই অস্বীকার করা হয়। যেমন- তোমার কোনো বন্ধু কারো মাধ্যমে তোমার নিকট কোনো সংবাদ প্রেরণ করল। এক্ষেত্রে সংবাদ বাহকের প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাহলেই কেবল বাহকের আনীত সংবাদ বিশ্বাস করা যাবে। কেননা সংবাদ বাহককে বিশ্বাস করা না গেলে তার আনীত সংবাদও বিশ্বাস করা যায় না। এতে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফলে তোমার বন্ধুর উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না।

তদ্রূপ নবি-রাসুলগণ হলেন সংবাদ বাহকের ন্যায়। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। যদি আমরা তাঁদের অস্বীকার বা অবিশ্বাস করি, তাহলে তাঁদের আনীত কিতাব ও বর্ণনার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তায়ালা, আখিরাত, কিয়ামত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবিশ্বাস জন্ম নেবে। সুতরাং সর্বপ্রথম তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালাই তাঁদেরকে সংবাদ বহনের জন্য মনোনীত করেছেন- এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে। তবেই আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইমানের সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করতে পারব। সুতরাং বোঝা গেল, রিসালাতে বিশ্বাস করার গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা সকল নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করব। কাউকে অবিশ্বাস করব না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে-

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

অর্থ : "আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৫)

অর্থাৎ আমরা সকলের প্রতিই বিশ্বাস করি। কারো প্রতি অবিশ্বাস করি না। নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস ২০২১
করা ফরজ। তাঁদেরকে অবিশ্বাস করলে ইমানদার হওয়া যায় না। বরং আমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা

নবি-রাসুলগণের কথায় বিশ্বাস না করে আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব, আমরা সমস্ত নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে চলব।

দলগত কাজ : রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর।

পাঠ ৮

ওহি (اَلْوَحْىُ)

ওহি (وَحْىٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ ইশারা, ইঙ্গিত, গোপন কথা ইত্যাদি। সাধারণত কোনো ব্যক্তির নিকট গোপনে প্রেরিত সংবাদকে ওহি বলা হয়।

ইসলামি পরিভাষায়, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি-রাসুলগণের নিকট প্রেরিত সংবাদ বা বাণীকে ওহি বলা হয়। যেমন- আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর আল-কুরআন নাজিল করেছেন। সুতরাং আল-কুরআন হলো ওহি।

ওহি অবতরণ

আল্লাহ তায়ালা নানাভাবে নবি-রাসুলগণের নিকট ওহি প্রেরণ করতেন। তন্মধ্যে দুটি পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ।

ক. ফেরেশতার মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা তার বাণী ফেরেশতার মাধ্যমে নবি-রাসুলগণের নিকট পৌঁছাতেন। যেমন- হযরত জিবরাইল (আ.) হলেন প্রধান ওহিবাহক ফেরেশতা। তিনি নবি-রাসুলগণের নিকট আল্লাহ তায়ালার বাণী নিয়ে হাজির হতেন।

খ. সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে। অনেক সময় আল্লাহ তায়ালা সরাসরি নবি-রাসুলগণের সাথে কথা বলতেন। যেমন- আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে তুর পাহাড়ে কথা বলেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.) ও মিরাজের রজনীতে আল্লাহ তায়ালার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।

প্রকারভেদ : ওহি প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

ক. ওহি মাতলু : অর্থাৎ যে ওহি তিলাওয়াত করা হয়। যেমন- কুরআন মজিদ। কুরআন মজিদ সালাতে তিলাওয়াত করা হয় বলে একে ওহি মাতলু বলা হয়।

খ. ওহি গায়র মাতলু : অর্থাৎ যে ওহি তিলাওয়াত করা হয় না। যেমন- হাদিস শরিফ। হাদিস শরিফ সালাতে তিলাওয়াত করা হয় না। এজন্য একে ওহি গায়র মাতলু বলে।

মহানবি (স.)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলে। হাদিসও ওহির অন্তর্ভুক্ত। কেননা মহানবি (স.) নিজ থেকে কিছু বলতেন না বরং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েই তিনি কথা বলতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۞ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ۞

অর্থ : "আর তিনি (হযরত মুহাম্মদ স.) মনগড়া কোনো কিছু বলেন না। বরং এটা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন-নাজ্‌ম, আয়াত ৩-৪)

গুরুত্ব

ওহি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওহি সরাসরি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাজিল হয়। এটা হলো অকাট্য জ্ঞান। এতে কোনোরূপ ভুলত্রুটি নেই। ওহির সংবাদ সকল প্রকার সন্দেহের ঊর্ধ্বে। ওহি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সকল প্রকার জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতারিত বলে এ জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ ও অতুলনীয়। আমরা নিজেদের গৃহ সম্পর্কে ভালোভাবে জানি। আমাদের গৃহে কোথায় কোন জিনিস রাখা আছে তা আমরাই সবচেয়ে ভালো বলতে পারব। বাইরের কেউ তা পারবে না। তদ্রূপ আমরাও অন্যের ঘরে কোথায় কী আছে তা বলতে পারব না। তেমনিভাবে আল্লাহ সারা বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তিনি নিজ কুদরতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার হুকুমেই সকল কিছু পরিচালিত হয়। পৃথিবীর কোথায় কোন জিনিস কী অবস্থায় আছে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। প্রত্যেক জিনিসের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি অবহিত। সুতরাং তিনি যে সংবাদ-জ্ঞান নাজিল করেন তা অকাট্য। কেউ এরূপ জ্ঞান খণ্ডন করতে পারে না।

আল-কুরআন ও হাদিস ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত। এগুলোর মাধ্যমেই আমরা ইসলামের সকল বিধি-বিধান জানতে পারি। তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির জ্ঞানও আমরা এগুলো থেকেই লাভ করি। এগুলো না থাকলে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। সুতরাং ওহির গুরুত্ব অপরিসীম। ওহির উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে মানুষের ইমান পূর্ণাঙ্গ হয়।

দলগত কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে একদল ওহির অর্থ ও প্রকার সম্পর্কে মুখস্থ বলবে এবং অন্যদল ওহির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে। আবার প্রথম দল গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবে, দ্বিতীয় দল ওহির অর্থ ও প্রকার সম্পর্কে মুখস্থ বলবে।

পাঠ ৯

আখিরাত (اَلْاٰخِرَةُ)

আখিরাত অর্থ পরকাল। পরকাল হলো ইহকালের বা দুনিয়ার জীবনের পরের জীবন। দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ জীবন নয়। বরং মানুষের জন্য আর একটি জীবন রয়েছে। সে জীবনই পরকালীন জীবন। পরকালীন জীবন অনন্ত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّإِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ○

অর্থঃ ''এ দুনিয়ার জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তুমাত্র। আর নিঃসন্দেহে আখিরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস।" (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত ৩৯)

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাতে বিশ্বাস ইমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আখিরাতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। আখিরাত অবিশ্বাস করলে মানুষ ইমানদার হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেন-

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۞

অর্থ : "আর তাঁরা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪)
আখিরাত হলো পরকাল। কবর, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাতের একেকটি পর্যায়। এ সবকটি বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে ইমান আনতে হবে। কোনোটিই অবিশ্বাস করা যাবে না। বলা হয়ে থাকে,

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

অর্থ : 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র।'

অর্থাৎ দুনিয়া হলো আমল করার স্থান। আখিরাত হলো ফলভোগের স্থান। সেখানে মানুষ কোনো আমল করতে পারবে না। বরং দুনিয়াতে মানুষ যেরূপ আমল করেছে সেরূপ ফল ভোগ করবে। কৃষক শস্যক্ষেত্রে যেরূপ চাষাবাদ করে, সেরূপই ফল লাভ করে। জমিতে ধান লাগালে ফসল হিসেবে ধানই পাওয়া যায়। আর কেউ যদি জমিতে কাঁটাগাছ রোপণ করে তবে সে শুধু কাঁটাই লাভ করে। দুনিয়ার জীবনও তদ্রূপ। আর দুনিয়াতে যে ব্যক্তি ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, সে আখিরাতে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। তাঁর আবাসস্থল হবে চিরশান্তির স্থান জান্নাত। অন্যদিকে যে ব্যক্তি ইমান আনবে না এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ করবে, আখিরাতে সে শাস্তি ভোগ করবে। তার ঠিকানা হবে শাস্তি ভোগের স্থান জাহান্নাম। সে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল পুড়বে। আখিরাতে কোনো মানুষ মৃত্যুবরণ করবে না। বরং চিরকাল ধরে শান্তি অথবা শাস্তি ভোগ করবে।

আখিরাতে বিশ্বাস করলে মানবজীবন সুন্দর হয়। মানুষ উত্তম চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে সব ধরনের খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ কোনোরূপ অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি, মিথ্যাচার, অশ্লীল কাজকর্ম করতে পারে না। বরং সে সর্বদা উত্তম ও নেক কাজে আগ্রহী হয়। আখিরাতে শান্তির আশায় মানুষ দুনিয়াতে ভালো গুণাবলির অনুশীলন করে। ফলে মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব, আমরা আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করব। আখিরাতে শান্তি ও সফলতা লাভের জন্য দুনিয়ায় নেক আমল করব। আমাদের দুনিয়ার জীবন শান্তিময় হবে। আর পরকালে আমরা জান্নাত লাভ করব।

সিরাত (اَلصِّرَاطُ)

সিরাত শব্দের অর্থ পথ, রাস্তা, পুল, পদ্ধতি ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, সিরাত হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি পুল। এ পুল পার হয়ে জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আখিরাতে সকল মানুষকেই এ পুলের উপর আরোহণ করে তা অতিক্রম করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। যে নেক আমল করবে মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। জান্নাতিগণ সিরাতের উপর দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁদের আমল অনুসারে সিরাত নানারকম হবে। কারো জন্য সিরাত হবে বিশাল ময়দানের মতো। আবার কম নেককারদের জন্য তাদের আমল অনুসারে সিরাতের প্রশস্ত কম হবে। ইমানদারগণ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী সিরাত অতিক্রম করবেন। কেউ বিদ্যুৎগতিতে সিরাত পার হবেন। কেউ ঝড়ের গতিতে, কেউ ঘোড়ার গতিতে, কেউ দৌড়ের গতিতে, আবার কেউ হেঁটে হেঁটে সিরাত পার হবেন। কম আমলকারী জান্নাতিগণ হামাগুঁড়ি দিয়ে অতিকষ্টে সিরাত পার হবেন।

সিরাত হলো অন্ধকার পুল। সেখানে ইমান ও নেক আমল ব্যতীত আর কোনো আলো থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ায় যে দৃঢ় ইমান এবং বেশি নেক আমলের অধিকারী হবে, সিরাত হবে তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি আলোকিত। ইমানের আলোতে সে সহজেই সিরাত অতিক্রম করবে। জান্নাতিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁর পূর্বে কেউই এ মর্যাদা লাভ করবে না।

অন্যদিকে জাহান্নামিদের জন্য সিরাত অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান। তাদের জন্য সিরাত হবে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম এবং তরবারি অপেক্ষা ধারালো। সেখানে কোনো আলো থাকবে না। বরং সিরাত হবে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এমন অবস্থায় তারা সিরাতে আরোহণ করবে। তারা কিছুতেই সিরাত অতিক্রম করতে পারবে না। বরং তাদের হাত-পা কেটে তারা জাহান্নামে পতিত হবে।

সিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন,

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝

অর্থ : "এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৭১)

এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

يُوْضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ

অর্থ : "জাহান্নামের উপর সিরাত স্থাপিত হবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

আমরা সিরাতে বিশ্বাস করব। সহজে সিরাত অতিক্রম করার জন্য দুনিয়াতে বেশি বেশি নেক আমল করব।

মিযান (اَلْمِيْزَانُ)

মিযান অর্থ দাড়িপাল্লা, তুলাদণ্ড, মানদণ্ড বা পরিমাপ করার যন্ত্র। ইসলামি পরিভাষায়, যে পরিমাপক যন্ত্রের দ্বারা কিয়ামতের দিন মানুষের পাপপুণ্যকে ওজন করা হবে, তাকে মিযান বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ

অর্থ : "আর আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ৪৭)

আমরা নিশ্চয়ই দাড়িপাল্লা দেখেছি। এর দুটি পাল্লা থাকে এবং মাঝে একটি দণ্ড থাকে। এগুলোর মাধ্যমে আমরা নানা জিনিস পরিমাপ করে থাকি। মিযানও তেমনি একটি মানদণ্ড। এর দুটি পাল্লাতে মানুষের সকল আমল ওজন করা হবে। এর এক পাল্লায় থাকবে পুণ্য এবং অন্য পাল্লায় উঠানো হবে পাপ। যে ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে হবে জান্নাতি। আর যে ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে এবং পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে জাহান্নামি হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۚ

অর্থ : "এবং যাদের পাল্লা (পুণ্যের) ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে।" (সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত ১০২-১০৩)

মিযানের পাল্লায় পুণ্য বা নেক কাজ বেশি হলে মানুষ সফলতা লাভ করবে। তার স্থান হবে জান্নাত। এজন্য বেশি বেশি নেক কাজ করা উচিত। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের নেকির পাল্লা ভারী করার জন্য বহু আমল শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ

অর্থ : 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা মিযানের নেকির পাল্লা পূর্ণ করে দেয়।' (সহিহ্ মুসলিম)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন- 'দুটি বাক্য এমন আছে, যা দয়াময় আল্লাহর নিকট প্রিয়, উচ্চারণে সহজ এবং মিযানের পাল্লায় ভারী। এ দুটি বাক্য হলো-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযিম।

আমরা এ দোয়া দুটি শিখব এবং বেশি বেশি পাঠ করব। এতে আমাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ভালোবাসবেন এবং আমরা আখিরাতে সফলতা লাভ করব।

দলগত কাজ : আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব।
বাড়ির কাজ : আখিরাতের পর্যায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মহান আল্লাহকে একক সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে কী বলে?

ক. আকাইদ   খ. তাকওয়া

গ. তাওহিদ   ঘ. আনুগত্য

২। শিরকের মাধ্যমে মানুষ –

i. আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে

ii. রিসালাতে অবিশ্বাস করে

iii. অন্য সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ছামি ও সাকিব দুই বন্ধু। ছামি নামায আদায় করে, কিন্তু সাকিব তা আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায়। ছামি এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য সাকিবকে বোঝানোর চেষ্টা করে।

৩। সাকিবের এ কাজটি কিসের শামিল?

ক. কুফরির খ. মুনাফিকির

গ. বিদয়াতের গ. শিরকির

৪। ছামির বোঝানোর বিষয়টি হচ্ছে –

i. সামাজিক দায়িত্ব পালন

ii. ইমানি দায়িত্ব পালন

iii. মুত্তাকি হওয়ার বাসনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সমাজপতি রাজা মিয়ার ভয়ে মানুষ তটস্থ থাকে। তিনি মানুষের সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার করেন। তাঁর প্রকল্পে কর্মরত জনাব ফরিদ উদ্দিনকে নামায পড়তে নিষেধ করে বলেন, নামায আবার কিসের জন্য, কাজ কর তাহলেই সুখ পাবে। কিন্তু ফরিদ উদ্দিন নিয়মিত নামায আদায় করেন এবং তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। অবশেষে রাজা মিয়া ফরিদ উদ্দিনের দায়িত্বশীলতায় খুশি হন এবং তাঁকে পদোন্নতি দেন।

(ক) তাওহিদ কী?

(খ) 'আর তাঁরা (মুত্তাকিগণ) আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।' আয়াতটি ব্যাখ্যা কর।

(গ) নামাযের প্রতি রাজা মিয়ার মনোভাব ইসলামের দৃষ্টিতে কিসের শামিল? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) যে মূল বিশ্বাসের ফলে ফরিদ উদ্দিন নামাযে দৃঢ় ও দায়িত্বশীল- তা বিশ্লেষণ কর।

২। জাকারিয়া সাহেব একজন ন্যায় বিচারক। ন্যায় বিচারের কারণে ঘুষ লেনদেনকারীরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়। এমনকি তাঁকে বদলি করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বিচারক সাহেব এটা জানার পরেও তার কর্তব্যে অবিচল থাকেন। তিনি আসমাউল হুসনার বিষয়গুলো নিজের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন এবং আল্লাহর ভয়ে সবসময় ভীত থাকেন। বিচারকের এমন মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে অবশেষে ঘুষ লেনদেনকারীরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

(ক) 'আসমাউল হুসনা' কী?

(খ) 'কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়'-আয়াতটি ব্যাখ্যা কর।

(গ) আল্লাহর যে গুণের ভয়ে বিচারপতি জাকারিয়া সাহেব ভীত থাকেন তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) 'আল্লাহু সাবুরুন' গুণের সাথে বিচারকের গুণের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

'ইবাদত' আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব, বন্দেগি, আনুগত্য ইত্যাদি। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুলুল্লাহ (স.) প্রদর্শিত পন্থায় জীবন পরিচালিত করাকেই ইবাদত বলে। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি আমরা যেমনি ইবাদত হিসেবে পালন করে থাকি, তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজ ইসলামি বিধি-বিধান মোতাবেক সম্পন্ন করাও ইবাদতের অংশ। আল্লাহ জিন ও মানবসন্তানকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ইমাম ও মুক্তাদির দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সালাতের পরিচয় – মাসবুকের সালাত, মুসাফিরের সালাত, রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত, জুমুআর সালাত, ঈদের সালাত, জানাযার সালাত, তারাবিহের সালাত, তাহাজ্জুদের সালাত, আওয়াবিনের সালাত ও ইশরাকের সালাত সম্পর্কে বলতে পারব।
- সালাতের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাওমের ধারণা, প্রকারভেদ এবং সাওম ভঙ্গের কারণ, সাওম মাকরুহ হওয়ার কারণ, সাওমের কাযা ও কাফ্ফারা সম্পর্কে বলতে পারব।
- সাহারি ও ইফতারের পরিচয়, সময়সূচি ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ইতিকাফ এবং সাদাকাতুল ফিতরের ধারণা, তাৎপর্য ও আদায়ের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাওমের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে। বাস্তব জীবনে সংযম, সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতা অনুশীলনে সাওমের (রোজার) গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত বা নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে সালাত। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে।

সালাত হচ্ছে জান্নাতের চাবিকাঠি ও আল্লাহর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম। সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখে। সালাতের প্রভাবে মানুষ শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হয় এবং ধনী-গরিব, সাদা-কালো মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়।

জামাআতে সালাত

জামাআত আরবি শব্দ। এর অর্থ একত্রিত হওয়া, সমবেত হওয়া প্রভৃতি। ইসলামি পরিভাষায়, নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় মুসলিম সম্প্রদায় ইমামের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করাকে জামাআতে সালাত আদায় বলে।

জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব

ফরজ সালাত একাকী আদায় করার চেয়ে জামাআতে আদায় করার প্রতি বিশেষ তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

অর্থ : "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪৩)

নবি করিম (স.) জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'একাকী সালাত আদায় অপেক্ষা জামাআতে আদায় করলে সাতাশগুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।' (বুখারি ও মুসলিম)। জামাআতে সালাত আদায়কারীকে নবি করিম (স.) খুবই পছন্দ করতেন। তিনি নিজে কখনো জামাআত ত্যাগ করেননি। আবার কেউ জামাআতে উপস্থিত না হলে তিনি খোঁজ নিতেন এবং এতে মহানবি (স.) অসন্তুষ্ট হতেন। তাই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন ও অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশায় প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে জামাআতে সালাত আদায় করতে হবে।

ইমাম

ইমাম অর্থ নেতা। যিনি সালাত পরিচালনা করেন, তিনিই ইমাম। অন্য কথায়, জামাআতে সালাত আদায়ের সময় মুসল্লিগণ (মুক্তাদি) যাকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে, তাকে ইমাম বলে। যার কিরাআত শুদ্ধ, সুন্দর ও ইসলামি জ্ঞান বেশি এবং বয়সে বড় তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্য। তাই একজন যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নির্বাচন করা উচিত।

ইমামের কর্তব্য

ইমামের কর্তব্য হচ্ছে সালাতে কাতার সোজা হলো কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখা। মুসল্লিদের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করা। সৎ উপদেশ দেওয়া এবং মুসল্লিদের প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। ইমাম হিংসা, বিদ্বেষ, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ইসলাম বহির্ভূত কাজকর্ম থেকে দূরে থাকবেন। তাঁর উচিত মুসল্লিদের অবস্থা দেখে সালাতে তিলাওয়াত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করা। মুসল্লিদের মধ্যে অনেকে বৃদ্ধ, রুগ্ণ, দুর্বল ও মুসাফির থাকতে পারে, তাই ইমামকে সকলের প্রতি লক্ষ্য রেখে সালাত আদায় করতে হবে। জামাআতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষকে শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা ও নেতার প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে এবং সামাজিক ঐক্যের প্রতিফলন ঘটায়।

মুক্তাদি

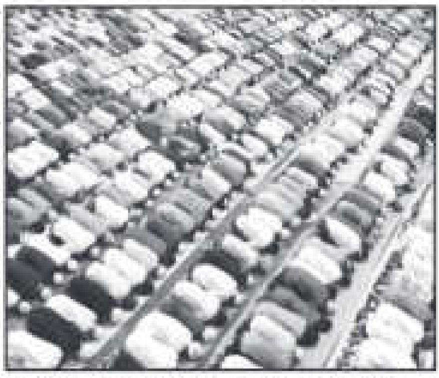

ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে অনুসরণপূর্বক যারা সালাত আদায় করে, তাঁদের মুক্তাদি বলা হয়। মুক্তাদি এই বলে সালাতের নিয়ত করবে যে, 'আমি এই ইমামের পেছনে সালাত আদায় করছি।' সালাতের যাবতীয় কাজে মুক্তাদিকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। মুক্তাদিগণ ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। যদি মুক্তাদি একজন হয় তবে ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে। যদি ইমাম তিলাওয়াতে ভুল করেন, তাহলে মুক্তাদি সংশোধন করে দেবে। আর যদি অন্য কোনো কাজে ভুল করেন, যেমন : দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসে, বসার পরিবর্তে দাঁড়ায়, তবে 'সুব্হানাল্লাহ্' বলে ইমামকে সংশোধন করে দেবে। (বুখারি)।

সালাত শেষে মুসল্লিগণ একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করবে। নিয়মিত কোনো মুসল্লি অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ খবর নেবে। নিয়মিতভাবে উক্ত অভ্যাস চর্চা করলে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে। ইমামের ভুল হলে বিরোধিতা না করে সংশোধনের জন্য সহযোগিতা করবে।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে ইমাম ও মুক্তাদির কর্তব্যগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।	
বাড়ির কাজ: জামাআতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা কর।	

পাঠ ২

বিভিন্ন প্রকার সালাত

মাস্‌বুকের সালাত (صَلٰوةُ الْمَسْبُوْقِ)

যে ব্যক্তি নামাযে এক বা একাধিক রাকআত শেষ হওয়ার পর ইমামের সাথে জামাআতে অংশগ্রহণ করে, তাকে মাস্‌বুক বলে।

মাস্‌বুকের সালাত আদায়ের নিয়ম

মুসল্লি জামাআতে সালাত আদায় করতে গিয়ে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থাতেই নিয়ত করে নামাযে অংশগ্রহণ করবে। তারপর ইমামের সাথে যথারীতি রুকু সিজদাহ্ করে তাশাহহুদ পাঠের জন্য বসে যাবে। ইমাম সালাম ফিরালে সে মুসল্লি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো রুকু, সিজদাহ্ করে যথারীতি তাশাহহুদ, দরুদ, দোয়া মাসূরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবে। রুকুসহ ইমামের সাথে যে কয় রাকআত পাওয়া যায় তা আদায় হয়ে যায়। রুকুর পর ইমামের পেছনে ইক্তেদা বা নামাযে দাঁড়ালে ঐ রাকআত মাস্‌বুককে আদায় করতে হবে।

মুক্তাদির সালাত এক, দুই, তিন, চার রাকআত ছুটে গেলে, তা আদায়ে কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

নিম্নে এসবের বর্ণনা করা হলো :

মুক্তাদি ইমামের পেছনে ইক্তেদা করার আগে যদি এক রাকআত ছুটে যায়, তবে ইমামের সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া এক রাকআত একাকী সালাত আদায়ের ন্যায় আদায় করে নেবে।

দুই রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া দুই রাকআত যথানিয়মে আদায় করবে, যেভাবে ফজরের দুই রাকআত ফরজ সালাত একাকী আদায় করা হয়।

তিন রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এক রাকআত যথানিয়মে আদায় করে প্রথম বৈঠক করবে। এ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর আবার দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকি দুই রাকআত যথানিয়মে আদায় করে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ, দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। যথানিয়মে ছুটে যাওয়া রাকআতগুলো এমনভাবে আদায় করে নেবে, যেভাবে একজন মুসল্লি একাকী চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করে থাকে।

দলগত কাজ : কোনো এক শিক্ষার্থী মাগরিবের নামায আদায় করতে মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে এক রাকআত পেয়েছে। অবশিষ্ট নামায কীভাবে আদায় করবে? শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

মুসাফিরের সালাত (صَلٰوةُ الْمُسَافِرِ)

'মুসাফির' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভ্রমণকারী। কমপক্ষে ৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দূরবর্তী কোনো স্থানে যাওয়ার নিয়তে কোনো ব্যক্তি তার নিজ এলাকা/শহর থেকে বের হলে শরিয়তের পরিভাষায় তাকে মুসাফির বলে। এমন ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কমপক্ষে পনেরো দিন অবস্থানের নিয়ত না করা পর্যন্ত তার জন্য মুসাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। শরিয়তে মুসাফিরকে সংক্ষিপ্ত আকারে সালাত আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সংক্ষিপ্তকরণকে আরবিতে কসর বলা হয়। মুসাফির অবস্থায় যোহর, আসর ও এশার ফরজ সালাত কসর পড়তে হয়। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ

অর্থ : "যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।"

(সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০১)

মুসাফিরের জন্য কসর সালাত আদায় করার অনুমতি আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন: 'এটি একটি সাদাকা, যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (মুসাফিরদের) দান করেছেন। এ সাদাকা তোমরা গ্রহণ কর।' (বুখারি ও মুসলিম)

মুসাফিরের সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকআত বিশিষ্ট অর্থাৎ যোহর, আসর ও এশার ফরজ সালাত মুসাফির ব্যক্তি দুই রাকআত করে আদায় করবে। ফজর, মাগরিব ও বিতরের নামাযে কসর নেই। এগুলো পুরোপুরি আদায় করতে হবে।

আল্লাহর দেওয়া সকল সুযোগ-সুবিধা খুশি মনে গ্রহণ করা উচিত। কাজেই কোনো মুসাফির ব্যক্তি যদি ইচ্ছে করে যোহর, আসর বা এশার ফরজ সালাত চার রাকআত আদায় করে, তবে আল্লাহর দেওয়া সুযোগ গ্রহণ না করায় গুনাহগার হবে। কিন্তু ইমাম যদি মুকিম (স্থায়ী) হয়, তাহলে সে ইমামের অনুসরণ করে পূর্ণ সালাত আদায় করবে। সফর একটি কষ্টকর বিষয়। তাই আল্লাহ তার বান্দার উপর সালাত সংক্ষিপ্ত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

দলগত কাজ : মুসাফির অবস্থায় কোন কোন নামায পূর্ণ এবং কোন কোন নামায কসর পড়তে হয় তার একটি তালিকা পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত (صَلٰوةُ الْمَرِيْضِ)

রোগী বা অক্ষম ব্যক্তি যথানিয়মে সালাত আদায় করতে না পারলে, তার জন্য ইসলামে সহজ নিয়মের অনুমোদন রয়েছে। রোগীর সেই সহজ নিয়মে সালাত আদায়কে রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত বলে।

রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম

রুগ্ণ ব্যক্তির জন্য জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। রোগ যত কঠিন হোক না কেন, সম্পূর্ণরূপে অপারগ না হলে সালাত ত্যাগ করা যাবে না। রোগীর দাঁড়াতে কষ্ট হলে বসে রুকু-সিজদাহ্‌র সাথে সালাত আদায় করবে। রুকু-সিজদাহ্ করতে অক্ষম হলে বসে ইশারায় সালাত আদায় করবে। ইশারা করার সময় রুকু অপেক্ষা সিজদায় মাথা একটু বেশি নত করতে হবে। মাথা দিয়ে ইশারা করতে হবে, চোখে ইশারা করলে সালাত আদায় হবে না। রুগ্ণ ব্যক্তিকে বসার সময় সালাতের অবস্থায় বসতে হবে। যদি রোগী এতোই দুর্বল হয় যে বসে থাকা সম্ভব নয়, তবে কিবলার দিকে পা দুটি রাখতে হবে। পা সোজা না রেখে হাঁটু উঁচু করে রাখতে হবে এবং মাথার নিচে বালিশ বা এ জাতীয় কিছু জিনিস রেখে মাথা একটু উঁচু রাখতে হবে। শুয়ে ইশারায় রুকু ও সিজদাহ্ করবে অথবা উত্তর দিকে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে এবং কিবলার দিকে মুখ রেখে ইশারায় সালাত আদায় করবে। যদি এভাবেও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে তার উপর সালাত আর ফরজ থাকে না, মাফ হয়ে যায়। অপারগ অবস্থায় বা কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়লে যদি চব্বিশ ঘণ্টা সময় অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বা তার চেয়ে কম সময় অতিক্রান্ত হয়, তাহলে সক্ষম হওয়ার পর রুগ্ণ ব্যক্তিকে কাযা করতে হবে। যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সময় অতিবাহিত হয়, তবে আর কাযা করতে হবে না। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে সালাত এমন একটি ইবাদত, যা সক্ষমতার শেষ সীমা পর্যন্ত আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে। কোনোভাবেই সালাত ত্যাগ করা যায় না।

দলগত কাজ : রুগ্ণ ব্যক্তির নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

জুমুআর সালাত (صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ)

সালাত এবং জুমুআ দুটিই আরবি শব্দ। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় জুমার সালাত। শুক্রবার যোহরের সময়ে যোহরের সালাতের পরিবর্তে যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে বলা হয় জুমার সালাত। প্রতি শুক্রবার জামে মসজিদে জুমার সালাত জামাআতে আদায় করা হয়।

গুরুত্ব

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ন্যায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, মুসলিম পুরুষের উপর জুমার সালাত আদায় করা ফরজ। আর এর অস্বীকারকারী কাফির। অবহেলা করে কেউ এ সালাত আদায় না করলে সে ফাসিক হয়ে যাবে। জুমার সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ : "হে মুমিনগণ। জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।" (সুরা আল-জুমুআ, আয়াত ৯)।

জুমার দিন সপ্তাহের উত্তম দিন। এদিনে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। এদিনে তাঁর তওবা কবুল হয়। এদিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এদিন দোয়া কবুলের উত্তম দিন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করে যথাসম্ভব পবিত্র হয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে জুমার সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায়, মসজিদে গিয়ে কাউকে কষ্ট না দিয়ে যেখানে জায়গা পায় সেখানেই বসে যায়, যথাসম্ভব সালাত আদায় করে এবং নীরবে বসে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনে, আল্লাহ তায়ালা তার বিগত জুমা হতে এ জুমা পর্যন্ত সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন।' (বুখারি)

জুমার সালাত আদায় না করলে ইসলামে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন : মহানবি (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে পরপর তিন জুমা ত্যাগ করে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় এবং তার অন্তরকে মুনাফিকের অন্তরে পরিণত করে দেওয়া হয়।' (তিরমিযি)

জুমার সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রথমে মসজিদে গিয়ে তাহিয়্যাতুল ওযু ও দুখুলুল মসজিদ দুই দুই রাকআত করে নফল সালাত আদায় করতে হয়। ফরজের আগে চার রাকআত কাবলাল জুমা ও পরে চার রাকআত বা'দাল জুমা আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

জুমার সালাতের জন্য দুটি আযান দেওয়া হয়। প্রথম আযান মসজিদের বাইরে মিনারে, দ্বিতীয়টি মসজিদের ভিতরে ইমাম সাহেব খুতবা দিতে মিম্বরে বসলে দেওয়া হয়। জুমার দুই রাকআত ফরজের পূর্বে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন। মুসল্লিদের খুতবা শোনা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা, অনর্থক কিছু করা নিষেধ। খুতবা শেষে ইমামের সাথে দুই রাকআত ফরজ সালাত অন্যান্য ফরজ সালাতের ন্যায় আদায়

করতে হয়। জুমার ফরজের জন্য জামাআত শর্ত। জামাআত ছাড়া জুমা সালাত হয় না। কোনো কারণে জুমাতে অংশগ্রহণ করতে না পারলে যোহরের সালাত আদায় করতে হয়। কাজেই জুমার সালাত যোহরের সময়েই পড়তে হবে।

সামাজিক শিক্ষা

জুমার সালাতে এলাকার লোকজন একত্রিত হয়। পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হয় এবং কুশলাদি বিনিময়ের সুযোগ হয়। সুখে-দুঃখে একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করার সুযোগ হয়। ইমামের পেছনে সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসল্লিগণ সালাত আদায় করে থাকে। ফলে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। মুসলিম ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়। সপ্তাহে একবার মিলিত হওয়া ও নেতার আদেশ-নিষেধ শুনে, তা মেনে চলার এক অনুপম আদর্শ প্রকাশিত হয় জুমার সালাতে। গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, যথাসম্ভব পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা ও প্রথম কাতারে বসার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়। মন প্রফুল্ল থাকে।

দলগত কাজ : জুমার সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

পাঠ ৩
ঈদের সালাত

ঈদ আরবি শব্দ। এর অর্থ আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি। ঈদের দিন হলো মুসলমানদের মহামিলন ও জাতীয় খুশির দিন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন আছে। আর আমাদের উৎসব হলো ঈদ।' (বুখারি ও মুসলিম)

বছরে দুটি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদের দিন এলাকার মুসল্লিগণ একত্রে ঈদগাহে যান এবং দুই রাকআত ঈদের সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানান।

ঈদুল ফিতর (عِيْدُ الْفِطْرِ)

ঈদ মানে আনন্দ। আর ফিতর অর্থ সাওম বা রোযা ভঙ্গ করা। ঈদুল ফিতর অর্থ সাওম ভঙ্গের আনন্দ। সুদীর্ঘ একটি মাস আল্লাহর নির্দেশ মতো রোযা পালনের পর বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় এদিনে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আনন্দ-উৎসব করে বলে একে ঈদুল ফিতর বলা হয়। রমযানের পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন মুসলমানগণ এ উৎসব পালন করেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উপর রমযান মাসে যে ইবাদত নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা পালন করার তাওফিক দান করায় মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে এদিন শুকরিয়া জানান এবং দুই রাকআত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব সালাত আদায় করেন।

গুরুত্ব

ঈদের দিন আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের খোঁজখবর নিতে হয়। সাধ্যমতো তাদের বাসায় মিষ্টান্ন খাদ্য যেমন: পিঠা, পায়েস, সেমাই ইত্যাদি খাবার পাঠাতে হয়। ধনী, গরিব, মিসকিন সকলের সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে হয়। এতে সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ঈদ আসে আনন্দের বার্তা নিয়ে, আসে সীমাহীন প্রীতি, ভালোবাসা ও কল্যাণের সংবাদ নিয়ে। সেই ঈদকে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

ঈদুল ফিতরের দিন দুটি কাজ ওয়াজিব: ১. ফিতরা দেওয়া ২. ঈদের দুই রাকআত সালাত ছয় তাকবিরের সাথে আদায় করা।

ঈদের দিনে সুন্নত কাজ

১. গোসল করা।

২. সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৩. পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা।

৪. সালাত আদায়ের পূর্বে মিষ্টি জাতীয় খাদ্য খাওয়া।

৫. ময়দানে গিয়ে ঈদের সালাত আদায় করা।

৬. ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবির বলতে বলতে যাওয়া।

৭. এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা।

ঈদের তাকবির

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

ঈদের সামাজিক শিক্ষা: বছরে দুই দিন মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ইত্যাদি ভুলে গিয়ে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। রমযানের রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষের তৃষ্ণা-ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে গরিবদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। সর্বোপরি গড়তে পারে একটি শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা ঈদুল ফিতর দিনের ওয়াজিব ও সুন্নত কাজগুলোর চার্ট তৈরি করে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

বাড়ির কাজ: ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঈদুল আজহা (عِيْدُ الْاَضْحٰى)

'ঈদুল আজহা' শব্দদ্বয় আরবি। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় কুরবানির ঈদ। বিশ্ব মুসলিম জাতি ত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ মহাসমারোহে পশু যবেহ করার মাধ্যমে জিলহজ মাসের দশম তারিখ যে উৎসব পালন করে থাকে,

তাকে ঈদুল আজহা বলে। আল্লাহর নবি হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর ইঙ্গিতে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। পুত্র ইসমাঈল (আ.) ও এটাই আল্লাহর ইচ্ছা জানতে পেরে আনন্দিত চিত্তে তা গ্রহণ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি হয়। এ স্মৃতি রক্ষার্থে মুসলমানগণ প্রতিবছর কুরবানি করে থাকেন। কুরবানির অতুলনীয় ইতিহাস স্মরণ করে মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে এদিন শপথ করে বলেন, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য যেভাবে আমরা পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, তেমনিভাবে আমরা তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করতেও সদা প্রস্তুত আছি।

গুরুত্ব

আর্থিক সংগতিসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানকে কুরবানি করতে হয়। এটা আল্লাহর বিধান। শুধু গোশত বা রক্তের নাম কুরবানি নয় বরং আল্লাহর নামে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার এক আন্তরিক শপথের নাম কুরবানি। কুরবানির মাধ্যমে মুসলমানের ইমান ও তাকওয়ার পরীক্ষা হয়ে থাকে। আর এই তাকওয়াই হচ্ছে কুরবানির প্রাণশক্তি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

অর্থ: "আল্লাহর নিকট সেগুলোর (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত পৌঁছায় না বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৩৭)

কুরবানির গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হয়ে যায়।' (তিরমিযি)। তিনি আরও বলেন, 'কুরবানির পশুর প্রত্যেকটি পশমের জন্য একটি করে সাওয়াব পাওয়া যায়।' (ইবনু মাজাহ)। সামর্থ্যবান ব্যক্তি কুরবানি না করলে রাসুলুল্লাহ (স.) অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, 'যে ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি না করে, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।' (ইবনু মাজাহ)। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও অশেষ পুণ্য পাওয়ার আশায় খুশি মনে কুরবানি করব।

কুরবানির গোশত বিতরণে মুস্তাহাব বিধান

কুরবানির গোশত তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ নিজের জন্য রেখে একভাগ আত্মীয় ও প্রতিবেশীকে এবং একভাগ গরিব মিসকিনকে দিতে হয়। এতে ধনীদের সাথে গরিবরাও ঈদের আনন্দে অংশীদার হওয়ার সুযোগ পায়।

ঈদুল আজহার ওয়াজিব কাজ

১. অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের সাথে ঈদুল আজহার দুই রাকআত সালাত আদায় করা।

২. কুরবানি করা। এছাড়া জিলহজ মাসের ৯ তারিখ ফজর হতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর তাকবিরে তাশরিক একবার বলা ওয়াজিব। পুরুষগণ উচ্চস্বরে পড়বে আর নারীগণ নীরবে পড়বে। ঈদুল আজহার সুন্নত ঈদুল ফিতরের মতো। কেবল পার্থক্য এই যে, ঈদুল ফিতরের দিন সালাতের আগে আর ঈদুল আযহার দিন সালাত ও কুরবানির পর কিছু খাওয়া সুন্নত।

ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম

ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করা যায়। প্রথমে কাতার করে নিয়ত করবে। তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধবে। সানা পড়বে। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবে। প্রত্যেক তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠবে। প্রথম দুই তাকবিরে হাত বাঁধবে না। তৃতীয় তাকবিরে অন্যান্য সালাতের ন্যায় হাত বাঁধবে। ইমাম সাহেব স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবেন। মুসল্লিরাও তাঁর সাথে তাকবির বলবে। তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবে, হাত বাঁধবে না। চতুর্থ তাকবিরে রুকুতে যাবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত শেষ করবে। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুটি খুতবা দেবেন। প্রত্যেক মুসল্লির খুতবা শোনা ওয়াজিব। ঈদের মাঠে যাবার পথে ঈদুল আযহার তাকবির ঈদুল ফিতরের তাকবিরের অনুরূপ। আর ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি একই, শুধু নিয়তের বেলায় আলাদা নিয়ত করতে হবে।

সামাজিক শিক্ষা

ঈদের দিনে আমরা ভেদাভেদ ভুলে যাব। বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করব। একে অন্যের সাথে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেব, পরস্পরের সাথে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলব। একে অন্যের থেকে ভালোবাসার শিক্ষা গ্রহণ করব। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতায় আমাদের জীবনকে সুন্দর করে গঠন করার শিক্ষা গ্রহণ করব। সামাজিক সাম্যের শিক্ষা গ্রহণ করব।

দলগত কাজ : ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত সমবেত ক্লাসে একজন শিক্ষার্থী আদায় করে দেখাবে, অন্যরা ভুলগুলো তাদের নিজ নিজ খাতায় লিখবে। পরে আলোচনা করবে।

পাঠ ৪

সালাতুল জানাযা (صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ)

পরিচয়

'সালাতুল জানাযা' দুটিই আরবি শব্দ। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় জানাযার সালাত বা জানাযার নামায। মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কবরস্থ করার পূর্বে চার তাকবিরসহ যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে জানাযার সালাত বলে। জানাযার সালাত ফরজে কিফায়া। এলাকার কিছুসংখ্যক লোক এ সালাত আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে সালাত আদায় হয়ে যায়। কেউ আদায় না করলে এলাকার সবাই গুনাহগার হয়। এ সালাতে রুকু-সিজদাহ্ নেই।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানুষ মরণশীল। প্রত্যেককেই একদিন না একদিন মরতে হবে। মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের অনেক কর্তব্য আছে। মৃতকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো, তার জানাযার সালাত আদায় করা এবং সবশেষে তাকে কবরস্থ করা একান্ত কর্তব্য। মূলত জানাযার সালাত হলো মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া। যত বেশি লোক একত্রিত

হয়ে দোয়া করবে ততই তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই জানাযার সালাতে লোকসংখ্যা যত বেশি হবে, ততই ভালো, কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি হওয়ার জন্য জানাযা বিলম্ব করা ঠিক নয়। অধিক লোক একত্রিত করার জন্য মৃত্যুর সংবাদ চারদিকে প্রচার করা উচিত। আল্লাহর নিকট একদিন আমাদেরও ফিরে যেতে হবে, এ সালাত সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে, তার জন্য এক কিরাত (সাওয়াব) এবং যে ব্যক্তি দাফনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে, তার জন্য দুই কিরাত (সাওয়াব)। এক একটি কিরাত হলো উহুদ পাহাড় পরিমাণ।' (তিরমিযি)

জানাযার সালাত আদায়ের নিয়ম

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়ে কাফন পরানোর পর ইমাম তাকে সামনে রেখে তার বুক বরাবর দাঁড়াবেন। মুক্তাদিগণ ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। তারপর মনে মনে নিয়ত করবে, 'আমি কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পেছনে চার তাকবিরের সাথে জানাযার সালাত ফরজে কিফায়া আদায় করছি।'

প্রথম তাকবির বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধবে। পরে সানা পড়ে হাত বাঁধা অবস্থাতেই ইমামের সাথে দ্বিতীয় তাকবির বলবে। তারপর দরুদ শরিফ পড়ে ইমামের সাথে তৃতীয় তাকবির বলবে। তারপর নিম্নের দোয়াটি পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا – اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا
فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ – وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ –

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহয়িয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ ফাহু আলাল ইমান।

এই দোয়া পড়ে চতুর্থ তাকবির বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে। তাকবির বলার সময় হাত উঠবে না। মৃত ব্যক্তি যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক হয়, তবে তৃতীয় তাকবিরের পর নিম্নের দোয়াটি পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাতাঁও ওয়াজআলহু লানা আজরাঁও ওয়া জুখরাঁও ওয়াজ আলহু লানা শাফিআঁও ওয়া মুশাফ্ ফাআন।

মৃত ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা হলে পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাজআলহা লানা ফারাতাঁও ওয়াজ আলহা লানা আজরাঁও ওয়াজুখরাঁও ওয়াজআলহা লানা শাফিআতাঁও ওয়া মুশাফ্ফাআহ।

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় পড়বে :

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়াআলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ।

কবরের উপর মাটি দেওয়ার সময় পড়বে :

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

উচ্চারণ: মিনহা খালাকনাকুম ওয়াফিহা নুয়িদুকুম ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। (সুরা তা-হা, আয়াত ৫৫)

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের জানাযায় উপস্থিত হওয়া অন্যতম কর্তব্য। ভোগবিলাসে মত্ত উঁচু শ্রেণির মানুষ এবং সহায় সম্বলহীন দরিদ্র মানুষ উভয়কে একইভাবে সাদা কাপড়ে, খালি হাতে পরপারের যাত্রী হতে হবে – এ সালাত সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্ষণিকের জীবন অনাড়ম্বরভাবে কাটিয়ে ইমানসহ কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া সবার একান্ত কর্তব্য।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে জানাযার সালাতের গুরুত্ব নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করবে।
বাড়ির কাজ : জানাযার সালাত আদায়ের নিয়ম বর্ণনা কর।

পাঠ ৫

সালাতুত তারাবিহ (صَلٰوةُ التَّرَاوِيْحِ)

রমযান মাসে এশার সালাতের পর বিতরের পূর্বে যে সালাত আদায় করতে হয়, তাকে সালাতুত তারাবিহ বা তারাবিহের সালাত বলে। এ সালাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। নবি করিম (স.) নিজে এ সালাত আদায় করেছেন ও সাহাবিগণকে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সুন্নত সালাত জামাআতে আদায়ের বিধান নেই। তবে তারাবিহের সালাত জামাআতে আদায় করা সুন্নত। এ সালাত মোট বিশ রাকআত।

তারাবিহ-এর সালাত আদায়ের নিয়ম

রমযান মাসে এশার ফরজ ও দুই রাকআত সুন্নতের পর বিতরের পূর্বে তারাবিহের নিয়তে দুই রাকআত করে মোট বিশ রাকআত সালাত আদায় করতে হয়। প্রতি চার রাকআত অন্তর বসে বিশ্রাম নিতে হয়। তখন বিভিন্ন তাসবিহ পড়া যায়। নিম্নের দোয়াটিও পড়া যায়–

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ –
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا – سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ –

উচ্চারণ : সুবহানাযিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাযিল ইযযাতি ওয়াল আজমাতি ওয়াল হায়বাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়ালজাবারুতে। সুবহানাল মালিকিল হাইয়িল্লাযি লাইয়ানামু ওয়ালাইয়ামুতু আবাদান

আবাদা। সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়ারাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ।
তারাবিহের সালাত শেষ করে বিতরের সালাত রমযান মাসে জামাআতে আদায় করার বিধান রয়েছে।

তারাবিহ-এর সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

পবিত্র রমযান মাস রহমতের ও বরকতের মাস। পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় হলো রমযান মাস। সারা দিন সাওম (রোযা) পালনের পর বান্দা যখন ক্লান্ত শরীরে তারাবিহের বিশ রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে, তখন আল্লাহ সে বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন। বান্দার জন্য এমন সুযোগ বছরে মাত্র একবারই আসে। তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর রহমত পেতে ব্রতী হন। এ প্রসঙ্গে নবি করিম (স.) বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে আখিরাতে প্রতিদানের আশায় রমযানের রাতে তারাবিহের সালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।' (বুখারি)। তারাবিহের সালাত ছোট ছোট সূরার মাধ্যমে আদায় করা যায়। আবার কুরআন খতমের মাধ্যমেও আদায় করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে, সূরাগুলো স্পষ্ট, ধীরস্থির ও ছন্দের সাথে পড়তে হবে। রমজান মাসে তারাবিহের সালাত একত্রিত হয়ে জামাআতে আদায় করা উত্তম। এতে নামাযে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। পূর্ণ একটি মাস পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের ফলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে।

দলগত কাজ : 'তারাবিহের নামায জামাআতে আদায় করলে ভুল কম হয়।' এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

পাঠ ৬
সালাতুত তাহাজ্জুদ (صَلٰوةُ التَّهَجُّدِ)

'তাহাজ্জুদ' আরবি শব্দ। এর অর্থ রাত জাগা, ঘুম থেকে ওঠা। মধ্যরাতের পর ঘুম থেকে উঠে যে সালাত আদায় করতে হয়, তাকে তাহাজ্জুদের সালাত বলে। তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা সুন্নত। এর গুরুত্ব অপরিসীম। নবি করিম (স.) প্রতিনিয়ত এ সালাত আদায় করতেন এবং সাহাবিগণকেও আদায়ের জন্য উৎসাহিত করতেন। মহানবি (স.)-এর উপর তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের জন্য বিশেষ তাগিদ ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ﴿ۖ﴾

অর্থ : "রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন। এ সালাত আপনার জন্য অতিরিক্ত।" (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৭৯)

কোনো কারণে তাহাজ্জুদের সালাত ছুটে গেলে মহানবি (স.) দুপুরের আগেই কাযা করে নিতেন।

গুরুত্ব

গভীর রাতে আরামের ঘুম ত্যাগ করে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত পাওয়ার আশায় তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, তখন আল্লাহ খুবই খুশি হন। তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। এ

সালাত আদায়ে পুণ্যময় জীবনের পথ প্রশস্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা এ সালাত আদায়কারীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'তারা শয্যা ত্যাগ করে, তাঁদের প্রতিপালককে আশায় ও ভয়ে ভয়ে ডাকে এবং তাঁদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাঁদের জন্যে নয়নাভিরাম কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাঁদের কৃতকার্যের পুরস্কারস্বরূপ।' (সূরা আস্-সাজদাহ: ১৬, ১৭)। তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'ফরজ সালাতের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট হলো তাহাজ্জুদের সালাত।' (মুসলিম)

প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হওয়া। তাহলেই আল্লাহ তার বান্দার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন।

তাহাজ্জুদের সময় ও আদায়ের নিয়ম

রাতের শেষার্ধে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা উত্তম। এ সালাত পড়া সুন্নত।

এ সালাত দুই রাকআত করে সুন্নত সালাতের নিয়মে আদায় করতে হয়। তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে কয়েকবার দরুদ পাঠ করা ভালো। এরপর বিতরের সালাত আদায় করা উত্তম।

দলগত কাজ : 'তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।' এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করবে।

পাঠ ৭

সালাতুল ইশরাক (صَلٰوةُ الْاِشْرَاقِ)

ইশরাকের সালাত সুন্নতে যায়িদা বা নফল। এ নামাযে রয়েছে অনেক ফজিলত। হাদিস শরিফে এর ফজিলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইশরাকের সালাত দুই রাকআত করে ৪, ৬, ৮ রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। ইশরাকের সালাতকে হাদিসে যুহার সালাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সময়

ইশরাকের সালাত ফজরের পরে আদায় করতে হয়। ফজরের সালাত আদায় করে বিছানাতে বসে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, তাহলিল ও দরুদ পাঠরত অবস্থায় থাকা এবং এ সময়ে কথাবার্তা বা কাজকর্ম না করাই উত্তম। সূর্য সম্পূর্ণরূপে উঠে গেলে এ সালাত আদায় করতে হয়। যদি কেউ ফজরের সালাতের পর দুনিয়ার কোনো আবশ্যকীয় কাজকর্ম করে এ সালাত আদায় করে, তবে তাও আদায় হবে। তবে সাওয়াব কম হবে। আমরা আল্লাহর নৈকট্য ও অধিক পুণ্য লাভের আশায় এ সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হবো।

সালাতুল আওয়াবিন (صَلٰوةُ الْاَوَّابِيْنَ)

এ সালাতও সুন্নতে যায়িদা। হাদিসে আওয়াবিন সালাতের অনেক ফজিলত বর্ণিত আছে। এ সালাত নিয়মিত আদায় করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়।

সময় ও আদায়ের নিয়ম

আওয়াবিনের সালাত মাগরিবের ফরজ ও দুই রাকআত সুন্নতের পর থেকে এশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়। আওয়াবিনের সালাত দুই রাকআত করে ছয় রাকআত পড়তে হয়। আমরা অধিক সাওয়াবের আশায় এ সুন্নত সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা ইশরাক ও আওয়াবিন সালাতের সময় ও রাকআত সংখ্যা ছক আকারে পোস্টারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের নৈতিক শিক্ষা

সালাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত ও কল্যাণপ্রসূ উপহার। সালাত মানুষকে সকল পাপাচার, অশ্লীলতা ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের অন্ধমোহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখে। মহান আল্লাহ বলেন –

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط

অর্থ : "নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

সালাত এক বড় নিয়ন্ত্রক শক্তি। প্রকৃত সালাত আদায়কারী মসজিদের বাইরে কোলাহল এবং দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তেও কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে না। সালাত মূলত বান্দার প্রতিটি গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। দুর্বল মন কখনো শয়তানের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে পড়লে বিবেক তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কিছুক্ষণ পরেই তোমাকে মসজিদে গিয়ে মহান প্রভুর দরবারে সিজদাহ্ বা মাথানত অবস্থায় উপস্থিত হতে হবে।

অপকর্ম করে তুমি কীভাবে সে দরবারে উপস্থিত হবে? এ ভাবনা তার মনে প্রবল হয়ে উঠলে সে আর অন্যায় পথে পা বাড়াতে পারে না। শয়তানি প্রলোভন হতে রক্ষা পায় এবং পুণ্যের পথে ফিরে আসে। প্রত্যেক মুসলমান যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতে আদায় করে, তাহলে অবশ্যই তাদের নৈতিকতার উন্নতি হবে। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি বা অনিয়মের আশ্রয় নেবে না। বরং তারা হয়ে উঠবে এ জাতির আদর্শ মানবসম্পদ।

দলগত কাজ : 'সালাতের নৈতিক শিক্ষা একজন মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ করে তোলে'। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে আলোচনা করবে।

সালাতের সামাজিক শিক্ষা

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার সামাজিক গুরুত্ব অনেক। ইমামের পেছনে সালাত আদায়ের অর্থ নেতার অনুসরণ। জামাআতে সালাত আদায়ের ফলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকে না। রাজা-প্রজা, ধনী–গরিব, ছোট-বড়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একই সারিতে দাঁড়ায়। এতে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের

প্রতিফলন ঘটে। দৈনিক পাঁচবার জামাআতে সালাত আদায় করলে পরস্পরের খোঁজখবর নেওয়া যায়, বিপদাপদে একে অপরের সাহায্য করা সম্ভব হয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হয়। তারা সামাজিক দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট হয়। এরূপ ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের অত্যন্ত দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে, তারা জাতির অমূল্য মানবসম্পদে পরিণত হয়।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত ব্যক্তিকে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। আর সালাতই হচ্ছে এর উত্তম প্রশিক্ষণ।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরস্পর আলোচনা করে সালাতের সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৮

সাওম (اَلصَّوْمُ)

সাওমের ধারণা

'সাওম' আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোযা বলে। রমযান মাসের রোযা পালন করা মুসলমানের উপর ফরজ। যে তা অস্বীকার করবে সে কাফির হবে। বস্তুত রোযা পালনের বিধান পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্য অপরিহার্য ইবাদত ছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন –

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

অর্থ : "হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৩)

রোযা পালন করলে মানুষ পরস্পর সহানুভূতিশীল হয়। ধনীরা গরিবের অনাহারে, অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট অনুধাবন করতে পারে। ফলে তারা দান-খয়রাতে উৎসাহিত হয়। রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষ হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, ধূমপানে আসক্তি ইত্যাদি বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে। হাদিসে বর্ণিত আছে –

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ

অর্থ : 'সিয়াম হচ্ছে ঢালস্বরূপ।' (বুখারি)

কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হলো রোযা। রোযা পালনের মাধ্যমে পানাহারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতে অনেক রোগ দূর হয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রোযার ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।'

২০২৫

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৫)। এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, রমযান মাসে কুরআন নাজিল হয়েছে বলে এটি অতি পবিত্র মাস। হাদিসে কুদসিতে আছে–

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

অর্থ : 'সাওম কেবল আমারই জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।' (বুখারি)। অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'জান্নাতের রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।' (বুখারি)। রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আখিরাতে সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করে, তার অতীত জীবনের সকল (সগিরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)। এ মাস ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাসে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোনো রোযা পালনকারীকে ইফ্তার করাবে, সে তার রোযার সমান সাওয়াব পাবে। অথচ রোযা পালনকারী ব্যক্তির সাওয়াবে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না। ফজিলতের দিক দিয়ে রমযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়ার।

সাওমের (রোযার) প্রকারভেদ

রোযা ছয় প্রকার। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, নফল ও মাকরূহ।

ক. ফরজ রোযা : বছরে শুধু রমযান মাসের রোযা পালন করা ফরজ এবং এর অস্বীকারকারী কাফির। রমযানের রোযার কাযাও ফরজ। বিনা ওযরে এ রোযা ত্যাগকারী ফাসিক ও গুনাহগার হবে।

খ. ওয়াজিব রোযা : কোনো কারণে রোযা পালনের মানত করলে তা পালন করা ওয়াজিব। কোনো নির্দিষ্ট দিনে রোযা পালনের মানত করলে সেদিনেই পালন করা জরুরি।

গ. সুন্নত রোযা : রাসুলুল্লাহ (স.) যে সকল রোযা নিজে পালন করেছেন এবং অন্যদের পালন করতে উৎসাহিত করেছেন, সেগুলো সুন্নত রোযা। আশূরা ও আরাফার দিনে রোযা পালন করা সুন্নত।

ঘ. মুস্তাহাব রোযা : চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা পালন করা মুস্তাহাব। সপ্তাহের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এবং শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা পালন করা মুস্তাহাব।

ঙ. নফল রোযা : ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব ছাড়া সকল প্রকার রোযা নফল। যে সকল দিনে রোযা পালন করা মাকরুহ ও হারাম, ঐ সকল দিন ব্যতীত অন্য যেকোনো দিন রোযা রাখা নফল।

চ. মাক্রুহ রোযা: মাকরুহ দুই প্রকার। (১) মাকরুহ তাহ্‌রিমি, যা বর্জিত হারাম রোযা। যেমন: দুই ঈদের দিনে ও জিলহজ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখে রোযা পালন করা হারাম। (২) মাকরুহ তানযিহি, যা অপছন্দনীয় কাজ। যেমন: মুহাররাম মাসের ৯ বা ১১ তারিখে রোযা পালন না করে শুধু ১০ তারিখে পালন করা। কারণ, এতে ইয়াহুদিদের সাথে সমাঞ্জস্য হয়। অনুরূপভাবে শুধু শনিবারে রোযা রাখা। কারণ, এতেও ইয়াহুদিদের সাথে মিল হয়ে যায়।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা সাওমের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে।

পাঠ ৯

সাহারি (اَلسَّحَرِيُّ)

'সাহারি' আরবি শব্দ। যা সাহারুন শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ ভোর, প্রভাত ইত্যাদি। রমযান মাসে রোযা পালনের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যে খাবার খাওয়া হয়, তাকে সাহারি বলে। সাহারি খাওয়া সুন্নত। রাসুলুল্লাহ (স.) নিজে সাহারি খেয়েছেন এবং অন্যদেরও খাওয়ার জন্য তাগিদ করতেন। মহানবি (স.) বলেছেন, 'সাহারি খাওয়া বরকতের কাজ। তোমরা সাহারি খাও।' (বুখারি)। সুবহে সাদিকের আগেই সাহারি খাওয়া শেষ করতে হবে। কিন্তু এত আগে সাহারি খাওয়া উচিত নয় যে, খাওয়ার পর অনেক সময় বাকি থাকে। ফলে অনেকে বিশ্রামের জন্য বিছানায় যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। এতে সালাত কাযা হয়ে যায়।

ইফতার (اَلْإِفْطَارُ)

'ইফতার' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভঙ্গ করা। ইসলামি পরিভাষায় সূর্যাস্তের পর নিয়তের সাথে হালাল বস্তু পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করাকে ইফতার বলে। ইফতার করা সুন্নত। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইফতার করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে শুরু করা এবং 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে শেষ করা উত্তম। তবে নিম্নোক্ত দোয়াটিও পড়া যায় :

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ-

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনার জন্য সাওম পালন করেছি এবং আপনার দেওয়া রিজিক দ্বারাই ইফতার করলাম।' (আবু দাউদ)। নিজে ইফতার করার সাথে সাথে অন্যকেও ইফতার করালে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে রোযাদারের সমান সাওয়াব পাবে।' (তিরমিযি)। আমরা অধিক সাওয়াব ও আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশায় নিজে ইফতার করব এবং অন্যকেও ইফতার করাব।

সাওম ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে সাওম ভঙ্গ হয় এবং একটির পরিবর্তে একটি সাওম পালন করা ফরজ হয়, তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেলার পর সাওম ভঙ্গ হয়েছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে।

২. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে গেলে।

৩. সাওম পালনকারীকে জোর করে কেউ কিছু পানাহার করালে।

৪. ভুলবশত রাত এখনো বাকি আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পর সাহারি খেলে।

৫. ইফতারের সময় হয়েছে মনে করে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে।

২০২৫

৬. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভর্তি বমি করলে।

৭. প্রশ্রাব-পায়খানার রাস্তার মাধ্যমে ওষুধ বা অন্য কিছু গ্রহণ করলে।

সাওম মাকরুহ হওয়ার কারণ

সাওম মাকরুহ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। নিম্নে কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. অন্যের গিবত অর্থাৎ দোষত্রুটি বর্ণনা করলে।

২. মিথ্যা কথা বললে, অশ্লীল আচরণ বা গালমন্দ করলে।

৩. কুলি করার সময় গড়গড়া করলে। কারণ এতে গলার ভিতর পানি ঢুকে গিয়ে রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে।

৪. যথাসময়ে ইফতার না করলে।

৫. গরমবোধে গায়ে ঠান্ডা কাপড় জড়িয়ে রাখলে বা বারবার কুলি করলে।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা সাহারি ও ইফতারের সময়সূচি ও দোয়া ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সাওমের (রোযার) কাযা ও কাফ্ফারা (قَضَاءُ الصَّوْمِ وَ كَفَّارَتُهُ)

কাযা

কোনো কারণে অনিচ্ছায় যদি সাওম ভেঙে যায় কিংবা কোনো ওযরে তা পালন করা না হয়, তবে একটি সাওমের পরিবর্তে একটি সাওমই রাখতে হয়। একে কাযা সাওম বলে।

সাওম কাযা করার কারণসমূহ

১. সাওম পালনকারী রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা সফরে থাকলে অথবা অন্য কোনো ওযরের কারণে সাওম পালনে অপারগ হলে।

২. রাত মনে করে ভোরে পানাহার করলে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভর্তি বমি করলে।

৪. জোরপূর্বক সাওম পালনকারীকে কেউ পানাহার করালে।

ফর্মা-৭ ৫. কুলি করার সময় অনিচ্ছায় পানি পেটে গেলে।

৬. ভুলক্রমে কোনো কিছু খেতে শুরু করার পর সাওম নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে পুনরায় খেলে।

৭. দাঁত হতে ছোলা পরিমাণ কোনো জিনিস বের করে খেলে।

উল্লিখিত অবস্থায় সাওম নষ্ট হলেও সারা দিন না খেয়ে থাকতে হয় এবং পরে কাযা করতে হয়।

কাফ্ফারা (اَلْكَفَّارَةُ)

ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পালন না করলে বা সাওম রেখে বিনা কারণে ভেঙে ফেললে কাযা এবং কাফ্ফারা উভয়ই ফরজ হবে।

সাওমের কাফ্ফারা নিম্নরূপ:

১. একাধারে দুই মাস সাওম পালন করা।

২. এতে অক্ষম হলে ৬০ জন মিসকিনকে পরিতৃপ্তির সাথে দুই বেলা খাওয়ানো অথবা

৩. একজন দাসকে স্বাধীনতা প্রদান করা।

একাধারে দুই মাস কাফ্ফারার সাওম আদায়কালীন যদি মাসে দুই-একদিন বাদ পড়ে যায়, তবে পূর্বের সাওম বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় নতুন করে শুরু করে দুই মাস বিরতিহীনভাবে সাওম পালন করতে হবে।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা সাওম কাযা ও কাফ্ফারার কারণ পৃথকভাবে পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১০

ইতিকাফ (اَلْاِعْتِكَافُ)

'ইতিকাফ' আরবি শব্দ। এর অর্থ অবস্থান করা, আটকে থাকা। শরিয়তের পরিভাষায় সাংসারিক কাজকর্ম ও পরিবার থেকে আলাদা হয়ে মসজিদে ইবাদতের নিয়তে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলা হয়।

ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। এলাকাবাসীর মধ্য থেকে একজন আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে। আর কেউ আদায় না করলে সকলেই দায়ী হবে। ইতিকাফকারী দুনিয়ার কাজকর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়। ফলে সে অনর্থক কথাবার্তা ও যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকে। আল্লাহর সাথে মনের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। একাগ্রচিত্তে কয়েক দিন ইবাদতের ফলে তার মনে আল্লাহর ভীতি গভীরভাবে সৃষ্টি হয়। ফলে দুনিয়ার চাকচিক্য তাকে আল্লাহর যিকর (স্মরণ) হতে দূরে সরাতে পারে না। ইবাদতে তার মনে শান্তি আসে। ইতিকাফের ফজিলত অনেক। রাসুলুল্লাহ (স.) নিয়মিতভাবে প্রতিবছর ইতিকাফ করতেন। হাদিসে আছে, 'রাসুলুল্লাহ (স.) প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন। এ আমল তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত বহাল ছিল। মহানবি (স.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর বিবিগণও এ নিয়ম পালন করেন।' (বুখারি)

রমযান মাসে লাইলাতুল কদর নামে একটি বরকতময় রাত আছে। যে রাত হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতে অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখে লাইলাতুল কদর খুঁজতে মহানবি (স.) নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় ইতিকাফ অবস্থায় থাকলে লাইলাতুল কদর লাভের সৌভাগ্য হতে পারে।

৯৫০১

আদায়ের নিয়ম

রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করা সুন্নত। এর সর্বনিম্ন সময় একদিন একরাত। রমযান মাস ছাড়াও মুস্তাহাব ইতিকাফ যেকোনো সময় পালন করা যায়। স্ত্রীলোক নিজ ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ করতে পারেন।

> **দলগত কাজ :** 'ইতিকাফের মাধ্যমে লাইলাতুল কদর পাওয়া সম্ভব।' দলে বিভক্ত হয়ে এ নিয়ে আলোচনার আয়োজন করবে।

সাদাকাতুল ফিতর (صَدَقَةُ الْفِطْرِ)

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সাওমের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গরিব-দুঃখীদের সহযোগিতায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সম্পদ দান করা হয়, তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে।

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য বা সমপরিমাণ অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে তাকে নিসাব বলে) সম্পদের মালিক প্রত্যেক স্বাধীন মুসলিম নর নারীর উপর 'সাদাকাতুল ফিতর' ওয়াজিব। শিশু ও পরাধীন (গোলাম) ব্যক্তির সাদাকা অভিভাবক আদায় করবে।

তাৎপর্য

যে বছর রোযা ফরজ হয়, সে বছরই রাসুলুল্লাহ (স.) মুসলমানদের সাদাকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন। মুসলমানগণ পবিত্র রমযান মাসে রোযা পালন করে। আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মশগুল থাকে। এসব দায়িত্ব পালনে অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়। রোযা পালনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তার ক্ষতিপূরণের জন্য শরিয়তে রমযানের শেষে 'সাদাকাতুল ফিতর' ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। ফিতর পেলে গরিব-অনাথ লোকেরাও ঈদের খুশিতে অংশীদার হতে পারে। এভাবেই ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমে আসে এবং সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে। হাদিসে আছে,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ

অর্থ: "রাসুলুল্লাহ (স.) যাকাতুল ফিতর আবশ্যক করেছেন রোযাদারদের অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য ও মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য।" (আবু দাউদ)।

আদায়ের নিয়ম

ঈদের সালাতের পূর্বে নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। ঈদের দুই-একদিন আগে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা যায়। তবে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে ঈদের মাঠে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা উত্তম। ঈদের পর কেউ যদি তা আদায় করে তবে আদায় হবে কিন্তু সাওয়াব কম হবে।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

২০২৪

মাথাপিছু নিসফু সা অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কেজি গম বা যব বা তার মূল্য আদায় করতে হবে।

> **দলগত কাজ :** শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়ের গুরুত্বের উপর আলোচনা করবে।

পাঠ ১১

সাওমের (রোযার) নৈতিক শিক্ষা

সাওম (রোযা) পালনের মাধ্যমে বান্দা একদিকে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, অপরদিকে তার নৈতিকতারও বিশেষ উন্নয়ন ঘটায়। সাওমের অনেক নৈতিক শিক্ষার মধ্যে কতিপয় শিক্ষা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. সংযম

মানুষের মধ্যে যেমন ভালো গুণ থাকে, তেমনি তার মধ্যে জৈবিক ও পাশবিক শক্তিও থাকে। পাশবিক শক্তি তাকে স্বেচ্ছাচারিতার পথে পরিচালিত করে। স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সমাজে অনাচার, কোন্দল, কলহ ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের স্বীয় প্রবৃত্তিকে সংযমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। রোযা মানুষকে এই সংযম শিক্ষা দেয়। মানুষের কুপ্রবৃত্তি তাকে তার খেয়ালখুশি মতো চলতে এবং সকল প্রকার অন্যায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। রমযানের সাওম এই অবাধ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৈধ পানাহার ও অন্যান্য জৈবিক চাহিদা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। এই সাওম চরম খাদ্যবিলাসী ও স্বেচ্ছাচারিতাকে সংযমী করে তোলে। পূর্ণ এক মাস এই সংযম মেনে চলার প্রশিক্ষণ তাকে গোটা বছর সংযমী হয়ে চলতে সাহায্য করে।

দলগত কাজ : 'মানুষের কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রোযার সংযম শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করবে।

২. সহমর্মিতা

যে ব্যক্তি কখনো অনাহারে থাকেনি, সে কীভাবে ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করবে? আর যে কখনো রোগাক্রান্ত হয়নি, সে কীভাবে রোগযন্ত্রণা অনুভব করবে? কোনো অভুক্ত পিপাসার্ত ভিক্ষুক বিত্তশালীদের দ্বারে উপস্থিত হয়ে যেন বিদ্রূপের শিকার না হয় - এটা রোযার অন্যতম শিক্ষা (অর্থাৎ অসহায় ক্ষুধার্তের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াও সাওমের শিক্ষা)। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, সকল মুমিন বান্দা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে পারে। গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়, আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম থাকে, তখন ধনীর দুলাল হোক আর গরিবের সন্তান হোক ক্ষুধার জ্বালা ও পিপাসার কাতরতা সমভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। একইভাবে রোযাদার ব্যক্তির দ্বারে যখনই কোনো অনাহারী অভুক্ত মানুষ আসবে, তখন অবশ্যই তার মনে দয়া বা সহমর্মিতা সৃষ্টি হবে। ধনী ও গরিবের মধ্যে আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা সাওম পালনের মাধ্যমে যতটা বৃদ্ধি পায়, অন্য কোনো ইবাদতের মাধ্যমে এগুলো এত বেশি সৃষ্টি হয় না।

এই উপলব্ধির বাস্তবতা পরীক্ষার জন্য রোযাদার ব্যক্তিকে ইফতার করানোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একজন রোযাদার অপরকে ইফতার করানোর মানেই হচ্ছে সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ।

বাড়ির কাজ : 'গরিবের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে সাওমের সহমর্মিতা শিক্ষা বিশেষ ভূমিকা রাখে' ব্যাখ্যা কর।

৩. সহিষ্ণুতা

সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য মুমিনের জন্য এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের অন্তর থাকে অস্থির ও চঞ্চল। যদি কোনো দ্রব্য তার আওতার মধ্যে থাকে, তবে তা পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনের এ অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে নিজ ইচ্ছামতো কাজ করলে সমাজে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে। একমাত্র সহিষ্ণুতার মাধ্যমে মনের কু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনাই এ ধৈর্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রোযা পালনকারী দিনের বেলায় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কিছু পানাহার করে না ও অন্যায় কাজ করে না। এমনকি জৈবিক চাহিদাটুকুও দমন করে রাখে। এটি ধৈর্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। কেউ যদি অভাব অনটনের কারণে আহারাদি সংগ্রহে অপারগ হয়, তবে রোযার মাধ্যমে অর্জিত ধৈর্যই হতে পারে তার একমাত্র অবলম্বন। এতে একদিকে যেমন রক্ষা হয় ইমান, তেমনি অপরদিকে শান্ত হয় পরিবার ও সমাজ।

বাড়ির কাজ : ইবাদত অধ্যায়ের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরবর্তী জীবনে কীভাবে কাজে লাগবে তার একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানুষকে সংযম শিক্ষা দেয় কোন ইবাদত?

ক. সালাত খ. যাকাত
গ. সাওম ঘ. হজ

২। 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়ের মাধ্যমে –

i. সাওম পালনের সকল দোষত্রুটি দূরীভূত হয়

ii. ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়

iii. গরিবের পানাহারের ব্যবস্থা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ধনাঢ্য ব্যক্তি মুরাদ সাহেব সাহারি খেয়ে যথারীতি সাওম শুরু করলেন। দুপুরে প্রচণ্ড গরম পড়াতে ইচ্ছা করে ভাত খেয়ে নিলেন। পরবর্তীতে তিনি কাযা হিসেবে একটি রোযা আদায় করলেন।

৩. মুরাদ সাহেবের কাজের মাধ্যমে লঙ্ঘিত হয়েছে–

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. নফল

৪. উপযুক্ত কারণে মুরাদ সাহেবকে–

i. কাযা করতে হবে

ii. কাফ্ফারা আদায় করতে হবে

iii. একাধারে এক মাস সাওম আদায় করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জমির উদ্দিন একজন কৃষক। সারাদিন তিনি মাঠেই কাজ করেন। নামাযের সময় হলে খেতের পাশে কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করেন। জুমার দিন তিনি মসজিদে না গিয়ে যোহরের সালাত আদায় করেন। তার প্রতিবেশী জহির উদ্দিন তাকে বললেন জুমার নামায আদায় করার জন্য শরিয়তের কিছু বিধান রয়েছে। আজান হয়ে গেছে। আমি মসজিদে যাচ্ছি। তুমিও আমার সাথে চলো। তখন জমির উদ্দিন বলেন, মসজিদ অনেক দূরে। কাজের ক্ষতি হবে বলেই খেতের পাশে যোহর নামায আদায় করছি।

(ক) 'ইবাদত' কী?
(খ) মুসাফির বলতে কী বোঝায়?
(গ) জুমার নামাযের ব্যাপারে জমির উদ্দিনের মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) জুমার নামায বিষয়ে জহির উদ্দিনের বক্তব্যের যৌক্তিকতা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। আসলাম ও আসগর সপ্তম শ্রেণির মেধাবী ছাত্র। পরীক্ষার সময় রমযান মাস থাকায় পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কথা ভেবে আসলাম রোযা ছেড়ে দেয়। মাঝে মধ্যে সালাত আদায়েও সে গাফলতি করে। অন্যদিকে কষ্টকর হলেও আসগর নিয়মিত রোযা পালন করে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে ওয়াক্ত হলেই সে নামায আদায় করে নেয়। আসগর আসলামকে নিয়মিত সালাত ও সাওম পালনের ব্যাপারে বললে আসলাম বলে এই

মুহূর্তে পরীক্ষায় ভালো ফলাফলই আমার নিকট মুখ্য। পরবর্তীতে আসগর তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষককে আসলামের বক্তব্যটি জানালে তিনি তাকে সাওমের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন।

(ক) 'ইতিকাফ' কী?
(খ) 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
(গ) আসলামের মনোভাবে কী প্রকাশ পেয়েছে? শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) আসগরের কাজের পুরস্কার কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

আল-কুরআন আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র বাণী। এটি মানবজাতির জন্য একটি বিশেষ নিয়ামত। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা এটি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাজিল করেছেন। আর নবি করিম (স.) আমাদের নিকট এ পবিত্র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ নিজে আমল করে তিনি আমাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মানুষের নিকট এ বাণীর মর্ম ও তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এ সমস্ত বাণী ও কর্মকে বলা হয় হাদিস। হাদিস আল-কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। ইসলামি বিধি-বিধান পূর্ণরূপে পালন করার জন্য আল-কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আল-কুরআনের পরিচয় ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আল-কুরআনের অবতরণ, সংরক্ষণ ও সংকলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- মাদ্দ ও ওয়াক্ফসহ তাজবিদ অনুযায়ী বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে পারব।
- আল–কুরআনের নির্বাচিত পাঁচটি সূরা অর্থসহ মুখস্থ বলতে ও মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নির্বাচিত সূরাগুলোর পটভূমি (শানে নুযুল) ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক (প্রার্থনামূলক) তিনটি আয়াত অর্থসহ বলতে পারব।
- হাদিসের গুরুত্ব ও সিহাহ্ সিত্তার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
- কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী নৈতিক জীবনযাপনের উপায় চিহ্নিত করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস অর্থসহ বলতে পারব।
- নৈতিক গুণাবলিবিষয়ক তিনটি হাদিস অর্থসহ বলতে পারব।
- হাদিসের আলোকে মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- হাদিসের আলোকে মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতামূলক আচরণগুলো চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ ১

কুরআন মজিদ

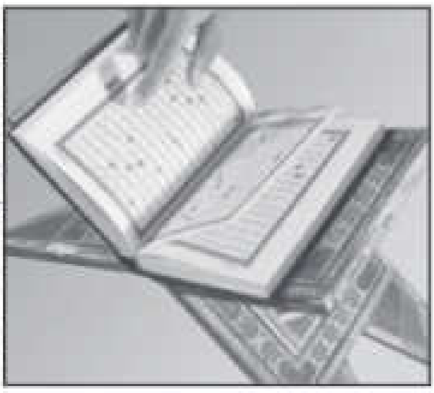

আল-কুরআন আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্র বাণী। এটি মুসলিমগণের ধর্মগ্রন্থ। কুরআন মজিদ বরকতময় গ্রন্থ। মানুষের প্রতি এটি আল্লাহ্ তায়ালার একটি বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহ্ তায়ালা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে এটি নাজিল করেন। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষে নাজিল করা হয়েছে। এরপর আর কোনো কিতাব আসেনি। আর ভবিষ্যতেও আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের বিধি-বিধান ও শিক্ষা বলবৎ থাকবে। এটি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হিদায়াতের উৎসস্বরূপ। আল-কুরআনের নির্দেশনা মেনে চললে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি ও সম্মান পাবে। আর আখিরাতে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۙ

অর্থ : "এই কিতাব আমি নাজিল করেছি, যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।" (সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১৫৫)

অবতরণ

আল্লাহ্ তায়ালা আল-কুরআন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর নাজিল করেন। আল-কুরআন 'লাওহে মাহফুয' বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। 'লাওহে মাহফুয' অর্থ সংরক্ষিত ফলক। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۙ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۟

অর্থ : "বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" (সূরা আল-বুরূজ, আয়াত ২১-২২)

লাওহে মাহফুয থেকে আল-কুরআন প্রথমে কদরের রাতে প্রথম আসমানের 'বায়তুল ইযযাহ' নামক স্থানে একসাথে অবতীর্ণ হয়। এটি ছিল রমযান মাসের লাইলাতুল কদর বা মহিমান্বিত রাত। আমরা এ রাতকে শবে কদরও বলে থাকি। এরপর প্রথম আসমান থেকে অল্প অল্প করে পুরো কুরআন মজিদ প্রিয় নবি (স.)-এর উপর নাজিল করা হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। তিনি আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় গোটা আরব ছিল অজ্ঞতা ও বর্বরতায় আচ্ছন্ন। তারা নানা মূর্তির পূজা করত। নানারূপ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করত। ঐতিহাসিকগণ সে সময়কে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' নামে আখ্যায়িত করেছেন। আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ।

নবি করিম (স.) আরবদের এরূপ অজ্ঞতা ও বর্বরতা পছন্দ করতেন না। তিনি সবসময় সত্য ও সুন্দরের অনুসন্ধান করতেন। এজন্য তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই তাঁর নিকট সর্বপ্রথম কুরআনের বাণী নাজিল হয়। তিনি সত্যের সন্ধান পান। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে মনোনীত করেন। এ সময় মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আ.) সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন। এটিই ছিল সর্বপ্রথম ওহি। এরপর মহানবি (স.) আরও ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজন অনুসারে আল-কুরআনের বিভিন্ন অংশ অল্প অল্প করে নাজিল করেন। এভাবে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে আল-কুরআন সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়।

আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। এটি সংরক্ষণ করার দায়িত্বও তারই। তিনি স্বয়ং আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ

অর্থ : "নিশ্চয়ই এর (আল-কুরআন) সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।"(সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত ১৭)

আল্লাহ আরও বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক।"(সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

আল-কুরআনের সংরক্ষক স্বয়ং মহান আল্লাহ। এজন্য আজ পর্যন্ত এটির কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি। আর ভবিষ্যতেও হবে না। এটি সকল প্রকার পরিবর্তন হতে মুক্ত। কেউ এতে নতুন কোনো কিছু সংযোজন করতে পারে না। আবার এর থেকে কোনো কিছু বাদও দিতে পারে না। আল-কুরআনের প্রতিটি হরকত, নুকতা, শব্দ, বাক্য সবকিছুই অপরিবর্তিত।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

আল-কুরআন সর্বপ্রথম হিফয করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। হিফয হলো মুখস্থ করা। যাঁরা পবিত্র কুরআন হিফয করেন তাঁদেরকে বলা হয় হাফিয। আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তারা খুব সহজেই নানা জিনিস স্মরণ রাখতে পারত। সম্ভবত আল-কুরআন মুখস্থ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁদের এরূপ স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন। কুরআন মজিদের কোনো অংশ নাজিল হলে সর্বপ্রথম মহানবি (স.) তা নিজে মুখস্থ করে নিতেন। এরপর তা সাহাবিগণকে মুখস্থ করতে বলতেন। মহানবি (স.)-এর উৎসাহ ও নির্দেশে সাহাবিগণ আল-কুরআন মুখস্থ করে রাখতেন। এভাবে কুরআন মজিদ স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করা হয়।

আল-কুরআন লেখনীর মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা হয়। কুরআনের কোনো অংশ নাজিল হলে তা মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখে রাখার জন্যও নবি করিম (স.) নির্দেশ দিতেন। যে সকল সাহাবি লিখতে জানতেন তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁদের বলা হয় কাতেবে ওহি বা ওহি লেখক। এঁদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। প্রধান ওহি লেখক সাহাবি ছিলেন হযরত যায়দ ইবনু সাবিত (রা.)। ওহি লেখক সাহাবিগণ সর্বদা নবি (স.)-এর সাথে থাকতেন। কুরআনের কোনো অংশ নাজিল হলে তাঁরা সাথে সাথেই তা লিখে রাখতেন। সে সময় আজকের ন্যায় কাগজ কিংবা কম্পিউটার ছিল না। তাই তখন কুরআন মজিদ খেজুর গাছের ডাল, পশুর হাড়, চামড়া, ছোট ছোট পাথর ইত্যাদিতে লিখে রাখা হতো। এভাবেও কুরআন মজিদ সংরক্ষণ করা হয়।

আল–কুরআন সংকলন

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায় আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়। ফলে সে সময় গ্রন্থাকারে তা সংকলন করা হয়নি। বরং সে সময় হিফয ও লেখনীর সাহায্যে আল-কুরআনকে সংরক্ষণ করা হয়। রাসুলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তিকালের পর আল-কুরআন সংকলন করা হয়।

মহানবি (স.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা মনোনীত হন। সে সময় কতিপয় ভণ্ড নবির আবির্ভাব ঘটে। হযরত আবু বকর (রা.) সেসব ভণ্ড নবির বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন। এ রকমই একটি যুদ্ধ ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ভণ্ড নবি মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করেন। তবে কুরআনের বহুসংখ্যক হাফিয শাহাদতবরণ করেন। এ অবস্থা দেখে হযরত উমর (রা.) ভাবলেন- কুরআনের হাফিযগণ এভাবে ইন্তিকাল করলে এর অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে কুরআন সংকলন করার পরামর্শ দেন। হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শ শুনে হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। তিনি প্রধান ওহি লেখক সাহাবি হযরত যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.)-কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশে হযরত যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.) সাহাবিদের নিকট সংরক্ষিত কুরআনের লিখিত অংশগুলো একত্র করেন। পাশাপাশি তিনি কুরআনের হাফিযগণের সাহায্যও গ্রহণ করেন। কুরআনের প্রতিটি অংশ তিনি লেখনী ও মুখস্থ এ উভয় পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে দেখেন। এভাবে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে আল-কুরআনের প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। আল-কুরআনের এ কপিটি খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর তা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকে। হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদতের পর এ কপিটি তাঁর মেয়ে উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত থাকে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তাঁর সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্য ছিল বিশাল-বিস্তৃত। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ও দেশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। এমনকি এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানা অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করে আল-কুরআনের একক ও প্রামাণ্য পাঠরীতি প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি হযরত যায়দ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে আরও সাতটি অনুলিপি প্রস্তুত করেন। এরপর বিভিন্ন প্রদেশে আল-কুরআনের এক এক কপি পাঠিয়ে দেওয়া

হয়। ফলে পবিত্র কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মুসলমানদের অনৈক্য দূর হয়। আল-কুরআন সংরক্ষণের এরূপ অসামান্য অবদানের জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে জামিউল কুরআন বলা হয়। জামিউল কুরআন অর্থ কুরআন সংকলক বা কুরআন একত্রকারী।

দলগত কাজ : এই পাঠ পড়ে কুরআন সংকলন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে একটি সারসংক্ষেপ লিখবে।

পাঠ ২
তাজবিদ (تَجْوِيْدٌ)

তাজবিদ আরবি শব্দ। এর অর্থ সুন্দর করা, বিন্যস্ত করা, সুন্দর করে সাজানো ইত্যাদি। আর ইসলামি পরিভাষায় আল-কুরআনকে শুদ্ধভাবে পাঠ করাকে তাজবিদ বলা হয়। কুরআন মজিদ পড়ার বেশ কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন : মাখরাজ, সিফাত, মাদ্দ, ওয়াক্‌ফ, গুন্নাহ ইত্যাদির নিয়ম সম্পর্কে অবগত হওয়া। এসব নিয়ম-কানুন সহকারে শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত করাকেই তাজবিদ বলা হয়। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা মাখরাজ সম্পর্কে জেনে এসেছি। এ শ্রেণিতে আমরা তাজবিদের আরও কিছু নিয়মকানুন জানব।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অনেক। এটি নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

مَنْ قَرَاَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَّالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ۝

অর্থ : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে, সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকির পরিমাণ হলো দশগুণ।' (তিরমিযি)

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ বা বর্ণ তিলাওয়াতের দশটি করে সাওয়াব লেখা হয়। যেমন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম)-এর মধ্যে ১৯টি বর্ণ রয়েছে। কেউ যদি এটি তিলাওয়াত করে তবে সে (১৯X১০) = ১৯০টি নেকি লাভ করবে।

অন্য হাদিসে মহানবি (স.) বলেছেন, 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কিয়ামতের দিন তা পাঠকারীদের পক্ষে সুপারিশ করবে।' (মুসলিম)

কুরআন শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে তিলাওয়াতের মাধ্যমে তিলাওয়াতের এসব ফজিলত লাভ করা যায়। এজন্য তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করা অত্যাবশ্যক। তাজবিদ সহকারে কুরআন পড়া আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। তিনি বলেছেন–

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ

অর্থ : "আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত ৪)

তাজবিদ না জেনে কুরআন পাঠ করলে তা শুদ্ধ হয় না। আর কুরআন পাঠ শুদ্ধ না হলে নামায সঠিকভাবে আদায় হয় না। এরূপ তিলাওয়াতকারী কোনো সাওয়াবও লাভ করবে না।

সুতরাং আমরা শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করব। আর এজন্য প্রথমেই তাজবিদ শিক্ষা করব। এরপর কুরআন পাঠের সময় এ নিয়মগুলোর অনুশীলন করব।

পাঠ ৩

মাদ্দ (مَدٌّ)

মাদ্দ শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা, লম্বা করা। তাজবিদের পরিভাষায় মাদ্দের হরফের ডান দিকের হরকতযুক্ত হরফ লম্বা করে পড়াকে মাদ্দ বলা হয়। যের, যবর ও পেশকে হরকত বলে।

মাদ্দের হরফ মোট তিনটি। যথা- আলিফ, ওয়াও, ইয়া (ا-و-ى)।

এ তিনটি হরফ নিম্নলিখিত অবস্থায় মাদ্দের হরফ হিসেবে উচ্চারিত হয় :

ক. ا (আলিফ)-এর পূর্বের হরফে যবর (ـَ) থাকলে। যেমন- بَا

খ. و (ওয়াও)-এর উপর জযম (ـْ) এবং তার ডান পাশের হরফে পেশ (ـُ) থাকলে। যেমন- بُوْ

গ. ى (ইয়া)-এর উপর জযম (ـْ) এবং এর ডান পাশের অক্ষরে যের (ـِ) থাকলে। যেমন- بِىْ

উপর্যুক্ত তিনটি অবস্থায় ا-و-ى মাদ্দের হরফ হিসেবে গণ্য হয়। ফলে এর পূর্বের অক্ষর একটু দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

প্রকারভেদ

মাদ্দ প্রধানত দুই প্রকার। যথা –

১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)

২. মাদ্দে ফারঈ (শাখা মাদ্দ)

নিম্নে এ দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)

মাদ্দের হরফের ডানে বা পরে জযম (ـْ) বা হামযা (ء) কিংবা তাশদিদ (ـّ) না থাকলে তাকে মাদ্দে আসলি বলে। মাদ্দে আসলিকে মাদ্দে তাব্‌য়িও বলা হয়। এরূপ মাদ্দে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

উল্লেখ্য, একটি সোজা আঙ্গুলকে স্বাভাবিকভাবে বাঁকা করে হাতের তালুতে লাগাতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে এক আলিফ পরিমাণ সময় বলে।

মাদ্দে আসলির উদাহরণ : نُوْحِيْهَا

এ শব্দটিতে একসাথে মাদ্দে আসলির তিন ধরনের উদাহরণ রয়েছে। যেমন-

ক. نُوْ এখানে و (ওয়াও)-এর উপর জযম (ـْ) এবং তার পূর্বের হরফ ن (নুন)-এর উপর পেশ (ـُ) রয়েছে।

খ. حِيْ এখানে ى (ইয়া)-এর উপর জযম (ـْ) এবং এর পূর্বের হরফ ح (হা)-এর নিচে যের (ـِ) রয়েছে।

গ. هَا এখানে ا (আলিফ)-এর পূর্বের হরফ ه (হা)-এর উপর যবর (ـَ) রয়েছে।

এ তিনটি ক্ষেত্রেই মাদ্দের হরফ و-ى-ا এর পূর্বে বা পরে জযম (ـْ) বা, হামযা (ء) বা তাশদিদ (ـّ) নেই। সুতরাং এগুলো মাদ্দে আসলি। এরূপ অবস্থায় ن-ح-ه (নুন, হা, হা) অক্ষরকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

কুরআন মজিদের যে সকল হরফের উপর খাড়া যবর (ـٰ), নিচে খাড়া যের (ـٖ) এবং উপরে উল্টো পেশ (ـٗ) রয়েছে, সে সকল হরফকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন-

إِلٰهِ النَّاسِ

لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ

مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ

এখানে ل (লাম) হরফের উপর খাড়া যবর (ـٰ), ه (হা) হরফের নিচে খাড়া যের (ـٖ) এবং ه (হা) হরফের উপর উল্টো পেশ (ـٗ) রয়েছে। সুতরাং, ل-ه-ه (লাম, হা, হা) হরফগুলোকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

২. মাদ্দে ফারঈ (শাখা মাদ্দ)

ফারঈ অর্থ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। মাদ্দে আসলি থেকে যে সকল মাদ্দ বের হয় তাকে মাদ্দে ফারঈ বলে। অর্থাৎ মাদ্দের হরফের পরে জযম (ـْ) বা হামযা (ء) বা তাশদিদ (ـّ) থাকলে সেসব স্থানে দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে মাদ্দে ফারঈ বলে।

উদাহরণ

ক. اَلْآٰنَ –এ শব্দে মাদ্দের হরফ-এর পর লাম হরফে জযম (ـْـ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ। অতএব, আমরা এ স্থানে হামযাকে লম্বা করে পড়ব।

খ. جَآءَ-وَمَآ اَدْرٰكَ –এ উদাহরণ দুটিতে মাদ্দের হরফ আলিফ-এর পর হামযা এসেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জিম (ج) ও মীম (م) হরফকে মাদ্দে ফারঈ হিসেবে দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

গ. وَلَا الضَّآلِّيْنَ-كَآفَّةً– আলোচ্য উদাহরণদ্বয়ে মাদ্দের হরফ আলিফ-এর পর লাম (ل) এবং ফা (ف) হরফে তাশদিদ (ـّـ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ-এর অন্যতম রূপ। এরূপ ক্ষেত্রেও হরফকে লম্বা করে পড়তে হবে।

উল্লেখ্য, আল-কুরআনের অনেক স্থানে হরফের উপর এসব মাদ্দের চিহ্ন দেওয়া থাকে। যেমন- (ـٓـ), (ـــ)। হরফের উপর এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফকে লম্বা করে পড়তে হয়। হরফের উপর (ـــ) চিহ্ন থাকলে চার আলিফ এবং (ـٓـ) চিহ্ন থাকলে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন- اُولٰٓئِكَ-مَآ اَغْنٰى

দলগত কাজ : মাদ্দের প্রকারভেদের একটি তালিকা তৈরি কর।
বাড়ির কাজ : মাদ্দের নাম ও কোন মাদ্দ কয় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয় তা লেখ।

পাঠ ৪

ওয়াক্ফ (وَقْفٌ)

ওয়াক্ফ আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরতি দেওয়া, থামা, স্থগিত রাখা ইত্যাদি। তাজবিদের পরিভাষায় তিলাওয়াতের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে বিরতি দেওয়াকে ওয়াক্ফ বলে। অন্য কথায়, দুই নিঃশ্বাসের মধ্যবর্তী বিরতির সময়কে ওয়াক্ফ বলা হয়।

আল-কুরআন তিলাওয়াতে ওয়াক্ফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আমরা বেশি সময় নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর আমাদের শ্বাস নিতে হয়। তিলাওয়াতের সময়ও একশ্বাসে পুরো তিলাওয়াত করা সম্ভব নয়। এজন্য আয়াতের মধ্যে থামতে হয়। আয়াতের মধ্যে এরূপ বিরতি দেওয়াই ওয়াক্ফ।

তাজবিদ হলো কুরআন সুন্দর ও শুদ্ধরূপে তিলাওয়াতের নাম। সুতরাং তিলাওয়াতকালে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থামা যাবে না। তাতে কুরআন তিলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। অনেক সময় অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। অতএব, নির্ধারিত স্থানে ওয়াক্ফ করতে হবে। আমাদের প্রিয় নবি (স.) সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াতের পর ওয়াক্ফ করতেন। ওয়াক্ফ করলে শেষ হরফের উপর জযম উচ্চারণ করতে হবে। কোনো হরকত (যবর, যের, পেশ) উচ্চারণ করে থামা যাবে না। তবে কেউ অপারগ হলে বা শ্বাস রাখতে না পারলে নির্ধারিত স্থানের

পূর্বেই ওয়াক্ফ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তিলাওয়াত করার সময় পুনরায় যে শব্দে ওয়াক্ফ করেছে, সে শব্দ থেকে তিলাওয়াত করতে হবে। আল-কুরআনে ওয়াকফের নানারকম চিহ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হলো বিরাম চিহ্ন। এগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে শুদ্ধভাবে ওয়াক্ফ করা যায়। নিম্নে এ সমস্ত চিহ্নসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো–

○- এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াক্ফ তাম'। এটি বাক্য বা আয়াতের চিহ্ন। অর্থাৎ এ চিহ্ন দ্বারা আয়াত শেষ হওয়া বোঝা যায়। এ চিহ্নে থামতে হবে।

م - একে 'ওয়াক্ফ লাযিম' বলে। এ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা অত্যাবশ্যক। এতে ওয়াক্ফ না করলে আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

ط - এটি 'ওয়াকফ মুতলাক'-এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নে ওয়াক্ফ করা উত্তম।

ج - এটি 'ওয়াক্ফ জায়িয'-এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা কিংবা না থামা উভয়ই জায়েয। তবে এতে ওয়াক্ফ করা ভালো।

ز - একে 'ওয়াক্ফ মুজাওয়ায' বলে। এ চিহ্নে না থামা ভালো।

ص - এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াক্ফ মুরাখ্খাস'। এখানে না থামা ভালো। তবে অপারগ হলে এ স্থানে থামা যাবে।

ق - এ চিহ্নে থামা ও না থামা প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। তবে এতে না থামা ভালো।

قف - এটি ওয়াকফ্ আমর। অর্থাৎ এতে থামার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে থামা উচিত।

لا - এটি না থামার নির্দেশ। এরূপ স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়তে হবে।

صل - এ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দেওয়া বা না দেওয়া উভয়ই জায়েয। তবে বিরতি দেওয়াই উত্তম।

صلی - এ স্থানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

س/سكتة - এ চিহ্নের নাম সাকতাহ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে শ্বাস ছাড়া যাবে না। অর্থাৎ পড়া বন্ধ থাকবে তবে শ্বাস জারি থাকবে।

∴/مع/معانقة - এ চিহ্নের নাম মুআনাকা। আয়াতের বা শব্দের ডানে এবং বামে (তিনবিন্দু) অথবা مع চিহ্ন থাকে। এ অবস্থায় তিলাওয়াতকালে এক স্থানে থামতে হয় এবং অপর স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়।

وقف النبی - ওয়াক্ফুন নাবি (স.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে প্রিয় নবি (স.) ওয়াকফ করেছিলেন।

وقف جبرائيل - ওয়াক্ফ জিবরাইল (আ.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দিলে বরকত লাভ হয়।

وقف غفران - ওয়াকফ গুফরান। এ স্থানে থামলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

> **দলগত কাজ :** শিক্ষার্থীরা ওয়াকফের চিহ্নসমূহের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

নাযিরা তিলাওয়াত

আল-কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অত্যধিক। পবিত্র কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করা যায়। আবার দেখেও পাঠ করা যায়। দেখে দেখে তিলাওয়াত করাকে নাযিরা তিলাওয়াত বলে। নাযিরা তিলাওয়াত একটি উত্তম ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা এরূপ তিলাওয়াতকারীকে আখিরাতে অত্যধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন। আমরাও বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করব।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

আল-কুরআন অত্যন্ত মর্যাদাবান গ্রন্থ। সুতরাং অত্যন্ত আদবের সাথে এ কিতাব তিলাওয়াত করা উচিত। আল-কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব নিচে দেওয়া হলো–

ক. পূর্ণরূপে ওযু করে পাক-পবিত্র জায়গায় বসা।

খ. পবিত্র কুরআনকে উঁচু কোনো কিছুর উপর রাখা।

গ. মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করা। কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা না করা।

ঘ. ধীরে ধীরে তাজবিদের সাথে তিলাওয়াত করা।

ঙ. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তিলাওয়াত করা।

শ্রেণির কাজ

- এ শ্রেণিতে নাযিরা তিলাওয়াতের পাঠ হলো– সূরা আল-বাকারার পঞ্চম রুকু থেকে অষ্টম রুকু পর্যন্ত।
- শিক্ষক প্রথমে দেখে দেখে শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। কোনোরূপ কথাবার্তা, হাসি–তামাশা, হট্টগোল করবে না।
- এরপর শিক্ষার্থীরা একেকজন করে তিলাওয়াত করবে। শিক্ষক তা শুনবেন। কারো কোনো ভুল হলে তা সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষকের নির্দেশনামতো শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভুলগুলো ঠিক করে নেবে।
- অতঃপর শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে পুনরায় তিলাওয়াত করবে এবং শিক্ষক শুনবেন। শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধরূপে তাজবিদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শিখবে। অতঃপর বাড়িতে নিয়মিত তিলাওয়াতের অভ্যাস করবে।

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআনের কতিপয় সূরা

পাঠ ৬

সূরা আল-আদিয়াত (سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ)

সূরা আল-আদিয়াত পবিত্র কুরআনের ১০০তম সূরা । এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয় । এ সূরায় প্রথম শব্দ আল- আদিয়াত । এ শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে । এ সূরায় আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ১১টি। তৎকালীন আরবে যখন এক ভয়ংকর অরাজকতা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল, আরবের গোত্রসমূহ পরস্পর রক্তপাত ও লুণ্ঠনে নিয়োজিত ছিল, কোনো গোত্রই নিরাপদে ছিল না । এ প্রেক্ষাপটে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয় একথা স্মরণ করে দেওয়ার জন্য যে, ধন-সম্পদের লোভে অন্যায় অসৎ কর্ম করলে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে ।

শব্দার্থ

وَ	-	শপথ, কসম
اَلْعٰدِيٰتِ	-	ধাবমান অশ্বরাজি
ضَبْحًا	-	ঊর্ধ্বশ্বাসে
فَالْمُوْرِيٰتِ	-	অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণকারী
قَدْحًا	-	ক্ষুরাঘাতে, ক্ষুরের আঘাতে
اَلْمُغِيْرٰتِ	-	হামলাকারী, আক্রমণকারী, অভিযানকারী
صُبْحًا	-	প্রত্যূষে, প্রভাতে, প্রভাতকালে
اَثَرْنَ	-	উৎক্ষিপ্ত করে
نَقْعًا	-	ধূলি
وَسَطْنَ	-	মধ্যে ঢুকে পড়ে
كَنُوْدٌ	-	অকৃতজ্ঞ
شَهِيْدٌ	-	সাক্ষী, অবহিত
حُبِّ	-	ভালোবাসা, আসক্তি
خَيْرِ	-	ভালো, কল্যাণ, ধন-সম্পদ
شَدِيْدٌ	-	কঠোর, কঠিন, প্রবল
بُعْثِرَ	-	উত্থিত হবে, উঠানো হবে
حُصِّلَ	-	প্রকাশ করা হবে
اَلصُّدُوْرِ	-	অন্তরসমূহ, বক্ষসমূহ
خَبِيْرٌ	-	অবহিত, সর্বজ্ঞাত

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে ।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١

১. শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির।

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢

২. যারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে ।

২০২৫

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ ٣

৩. যারা প্রভাতকালে অভিযান চালায়।

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ ٤

৪. আর সে সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ ٥

৫. অতঃপর শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ ٦

৬. নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ ٧

৭. আর সে এ বিষয়ে অবশ্যই অবহিত।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۗ ٨

৮. এবং নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ ٩

৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয়, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে?

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ ١٠

১০. এবং অন্তরে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করা হবে?

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۧ ١١

১১. সেদিন তাদের কী হবে, সে সম্পর্কে তাদের প্রতিপালক অবশ্যই সবিশেষ অবহিত।

ব্যাখ্যা

এ সূরা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সামরিক অশ্বের নানা গুণ বর্ণনা এবং এগুলোর শপথ করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষের দুটি বিশেষ স্বভাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো–

ক. স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

খ. সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা।

আর মানুষ স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে এ দুটি কাজ করে থাকে। অথচ এগুলো মানুষের করা একেবারেই অনুচিত।

এজন্য সূরার শেষ পর্যায়ে মানুষকে আখিরাত ও কবরের জীবনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ কি জানে না যে তাকে কবরে যেতে হবে। অতঃপর কিয়ামতে তাদের সকল কার্যকলাপ প্রকাশ করা হবে। এমনকি সে অন্তরে যেসব অকৃতজ্ঞতা ও লোভ-লালসা পোষণ করত, তাও প্রকাশ করা হবে। পরিশেষে সমস্ত কিছুর বিচার করা হবে। আর সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা খুব ভালোভাবেই অবহিত। সুতরাং মানুষের উচিত সকল অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতা ত্যাগ করে সৎপথে জীবনযাপন করা।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা লাভ করি :

- নিঃসন্দেহে মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।
- ধন-সম্পদের প্রতিও মানুষের আসক্তি প্রবল।
- আখিরাতে মানুষের অন্তরের গোপন বিষয়ও প্রকাশ করা হবে।
- অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মানুষের চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

অতএব, আমরা সর্বদা এ সূরার শিক্ষা মনে রাখব। আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব। কখনোই তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবো না। সাথে সাথে ধন-সম্পদের লোভে পড়ে অন্যায় ও অসৎ কাজ করব না। বরং আখিরাতে জবাবদিহি করার কথা স্মরণ রেখে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করব।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আদিয়াতের তিনটি শিক্ষা খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৭

সূরা আল-কারিআহ (سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ)

সূরা আল-কারিআহ মাক্কি সূরাসমূহের মধ্যে অন্যতম। এটি পবিত্র কুরআনের ১০১তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১টি।

এ সূরার প্রথম শব্দ আল-কারিআহ। কারিআহ অর্থ সজোরে আঘাতকারী। কিয়ামত বা মহাপ্রলয় পৃথিবীকে সজোরে আঘাত করবে বলে একে কারিআহ বলা হয়। এ সূরায় কিয়ামতের নানা অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-কারিআহ বা মহাপ্রলয়।

তৎকালীন আরবে মানুষ যখন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, লুটতরাজ ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল তখন তাদেরকে কিয়ামতের মহাপ্রলয় এবং হাশরের বিচার ও দোযখের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে।

শব্দার্থ

اَلْقَارِعَةُ	-	মহাপ্রলয়, সজোরে আঘাতকারী	مَوَازِيْنُ	-	পাল্লাসমূহ, পরিমাপ দণ্ডগুলো
يَوْمَ	-	দিন	عِيْشَةٍ	-	জীবন, জীবিকা
اَلْفَرَاشِ	-	পতঙ্গ	رَّاضِيَةٍ	-	সন্তোষজনক
اَلْمَبْثُوْثِ	-	বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো-ছিটানো	خَفَّتْ	-	হালকা হবে
اَلْجِبَالُ	-	পর্বতসমূহ	اُمُّ	-	স্থান, জায়গা, ঠিকানা
اَلْعِهْنِ	-	রঙিন পশম	هَاوِيَةٌ	-	হাবিয়া, গভীর গর্ত, এটি একটি জাহান্নামের নাম
اَلْمَنْفُوْشِ	-	ধুনিত	نَارٌ	-	আগুন
ثَقُلَتْ	-	ভারী হবে	حَامِيَةٌ	-	উত্তপ্ত, প্রজ্বলিত, জ্বলন্ত

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلْقَارِعَةُ ۙ

১. মহাপ্রলয়।

مَا الْقَارِعَةُ ۚ

২. মহাপ্রলয় কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۗ

৩. আপনি কি জানেন মহাপ্রলয় কী?

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ

৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۙ

৫. আর পর্বতসমূহ ধুনিত রঙিন পশমের মতো হবে।

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ

৬. অতঃপর সেদিন যার পাল্লা ভারী হবে।

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۙ

৭. সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন।

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ

৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে।

فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۙ

৯. তার স্থান হবে হাবিয়া।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۙ

১০. আপনি কি জানেন তা কী?

نَارٌ حَامِيَةٌ ۙ

১১. তা অতি উত্তপ্ত আগুন।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-কারিআহতে আল্লাহ তায়ালা দুই ধরনের বিষয় উল্লেখ করেছেন। সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কিয়ামতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করবেন। এজন্য এ সূরায় তিনি আল-কারিআহ বা মহাপ্রলয় শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সেদিন এ পৃথিবীর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বড় বড়

পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত সেদিন ধুনিত পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। মানুষ কীটপতঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আসমান, জমিন, সাগর, নদী, বন-জঙ্গল সবকিছুই সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন শুধু আল্লাহ তায়ালা থাকবেন। তিনি ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ সূরায় দ্বিতীয় পর্যায়ে শেষ ৬টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার কাজকর্মের পরিণতি বর্ণনা করেছেন। হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষের হিসাবনিকাশ নেওয়া হবে। মানুষের পাপপুণ্য পাল্লায় ওজন করা হবে। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি পুণ্য বা নেক কাজ করবে, তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে। সে লাভ করবে চিরশান্তির জান্নাত। সে সেখানে সন্তুষ্ট চিত্তে বসবাস করবে। অপরদিকে যার পুণ্যের পাল্লা হালকা হবে তার পাপের পাল্লা ভারী হবে। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হাবিয়া নামক দোযখ হবে তার বাসস্থান। হাবিয়া খুবই গভীর স্থান। এতে রয়েছে উত্তপ্ত আগুন। সেখানে পাপীরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

শিক্ষা :

- এ দুনিয়ার জীবন ও দুনিয়া উভয়ই ক্ষণস্থায়ী।
- মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা গোটা দুনিয়া ও সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন।
- হাশরে মানুষের ভালোমন্দের বিচার করা হবে।
- নেককার ব্যক্তির স্থান হবে চিরশান্তির জান্নাত।
- আর পাপীদের ঠিকানা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জাহান্নাম।

আমরা এ সূরাটি অর্থসহ মুখস্থ করব। এ সূরার শিক্ষা অনুসারে সর্বদা ভালো কাজ করব। অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকব।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আল-কারিআহর শিক্ষাগুলো লিখে বাড়ি থেকে একটি পোস্টার তৈরি করে নিয়ে আসবে।

পাঠ ৮

সূরা আত–তাকাসুর (سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ)

এ সূরার প্রথম আয়াতে বর্ণিত তাকাসুর শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা আত-তাকাসুর। এটি পবিত্র কুরআনের ১০২তম সূরা। এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি।

রাসুলুল্লাহ (স.) একদা সাহাবিগণকে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ক্ষমতা কারো নেই যে সে দৈনিক এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে। উত্তরে তারা বললেন, হ্যাঁ এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনেরই বা আছে? অতঃপর রাসুল (স.) বললেন, তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন সূরা তাকাসুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য, প্রতিদিন এই সূরা একবার পাঠ করা এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার সমান। (মাযহারি)

শানে নুযুল

কুরাইশের শাখাগোত্র ছিল বনু আবদি মানাফ, বনু কুসাই ও বনু সাহম। এদের প্রত্যেক গোত্র অপর গোত্রকে লক্ষ্য করে বলত, কি নেতৃত্ব, কি ক্ষমতা কিংবা জনসংখ্যা সবদিক থেকেই আমরা তোমাদের উপরে। এতে করে প্রথমে বনু আবদি মানাফই সবার উপরে প্রমাণিত হলো। শেষে সবাই বলল, আমাদের মধ্যে যারা মারা গেছে তাঁদেরকেও হিসাব করব। কাজেই তারা কবরস্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং কোনটা কার কবর তা বলে বলে গুনতে শুরু করল। এবার বনু সাহমের সংখ্যায় তিন পরিবার বেশি হলো। কেননা জাহিলি যুগে তাঁদের জনসংখ্যা বেশি ছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরা নাজিল হয়।

শব্দার্থ

أَلْهَاكُمُ - তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করেছে, মোহাবিষ্ট করেছে
التَّكَاثُرُ - প্রাচুর্য, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা
حَتَّىٰ - পর্যন্ত, যতক্ষণ না, এমনকি
زُرْتُمُ - তোমরা সাক্ষাৎ করেছ, তোমরা উপনীত হয়েছ, তোমরা মুখোমুখি হয়েছ।
الْمَقَابِرَ - কবরসমূহ
كَلَّا - কখনোই না
سَوْفَ - অচিরেই, শীঘ্রই
تَعْلَمُونَ - তোমরা জানবে
ثُمَّ - অতঃপর, আবার
لَوْ - যদি
عِلْمَ - জ্ঞান
الْيَقِينِ - দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চিত
الْجَحِيمَ - জাহিম, একটি জাহান্নামের নাম
عَيْنَ - চক্ষু, চোখ
يَوْمَئِذٍ - সেদিন
عَنِ - হতে, থেকে, সম্পর্কে
النَّعِيمِ - নিয়ামত

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۙ

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। (এমনকি এ অবস্থায় তোমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যাও)

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

৩. এটা সংগত নয়, তোমরা অচিরেই তা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৪. আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

৫. সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝

৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝

৭. আবার বলি, তোমরা তা অবশ্যই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে দেখবে।

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

৮. অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় ধন-সম্পদের মোহ ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ইত্যাদির প্রতি লোভী। প্রাচুর্য লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই মানুষের মৃত্যু এসে যায়। অথচ সে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কোনো প্রস্তুতিই নিতে পারে না। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা ধন-সম্পদ হলো ক্ষণস্থায়ী বিষয়। এগুলোর প্রতি মোহ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ আখিরাতের সাফল্য ও কল্যাণ এগুলোর তুলনায় কতোইনা উত্তম। মানুষের উচিত দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া। মানুষ যদি আখিরাতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করত তবে কখনোই দুনিয়ার প্রাচুর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতো না।

মৃত্যুর পর মানুষ আখিরাতকে বুঝতে পারবে। আখিরাতের নানা বিষয় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবে। অথচ সে তখন কিছুই করতে পারবে না। বরং দুনিয়ায় প্রাপ্ত নিয়ামত সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। দুনিয়ার লোভ-লালসা ও অন্যায়-অনৈতিকতার জন্য সে জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।

শিক্ষা :

- সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতি মোহাচ্ছন্ন থাকা উচিত নয়।
- এটি মানুষকে আখিরাত ভুলিয়ে দেয়।
- অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ উপার্জনকারী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।
- আখিরাতে সকল কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

অতএব, আমরা ধন-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা করব না। বরং বৈধভাবে প্রয়োজনমতো ধন-সম্পদ উপার্জন করব। আর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনামতো খরচ করব। অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা করব না।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আত-তাকাসুরের শানে নুযুল পাশের বন্ধুকে বলবে।	
বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আত-তাকাসুরের শিক্ষাগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।	

পাঠ ৯

সুরা আল-লাহাব (سُوْرَةُ اللَّهَبِ)

সুরা আল-লাহাব মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৫টি। এ সূরায় আবু লাহাবের চরিত্র ও পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা লাহাব। এটি আল-কুরআনের ১১১তম সূরা।

শানে নুযুল

একদা রাসুলুল্লাহ (স.) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশদের ডাক দিলেন। তৎকালীন সময়ে আরবে বিপদাপদের ক্ষেত্রে এভাবে আহ্বান করার প্রচলন ছিল। তাই রাসুল (স.)–এর ডাকে সকলেই পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলো। রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি যদি বলি যে এ পাহাড়ের অপর পাশে একটি শত্রুদল তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। যেকোনো সময় তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সকলেই সমস্বরে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করব। এরপর রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, আমি তোমাদের এক ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি। (তোমরা স্বীকার কর যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ কর।) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর এ দাওয়াত শুনে আবু লাহাব বলে উঠল–

تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا

অর্থ : 'তোমার ধ্বংস হোক। এজন্যই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ?'

অতঃপর আবু লাহাব রাসুল (স.)-কে পাথর মারতে উদ্যত হয়। আবু লাহাবের এ কথা ও কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন। (সহিহ্ বুখারি)

শব্দার্থ

تَبَّتْ	- ধ্বংস হোক, বিনষ্ট হোক।	ذَاتَ لَهَبٍ	- লেলিহান, শিখাযুক্ত
يَدَا	- দুইহাত	اِمْرَاَتُهٗ	- তার স্ত্রী
يَدٌ	- হাত	حَمَّالَةَ	- বহনকারিণী
مَآ اَغْنٰى	- কোনো কাজে আসেনি, কোনো উপকার আসেনি, রক্ষা করেনি	اَلْحَطَبِ	- কাঠ, লাকড়ি, ইন্ধন
كَسَبَ	- সে উপার্জন করেছে	جِيْدِهَا	- গলা

سَيَصْلٰى - সে অচিরেই প্রবেশ করবে		حَبْلٌ	- রশি, ফাঁস, রজ্জু
نَارًا - আগুন, দোযখ		مَسَدٍ	- পাকানো, প্যাঁচানো

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝

১. আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝

২. তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে তা কোনো কাজে আসেনি।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

৩. শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।

وَّامْرَاَتُهٗ ۗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

৪. এবং তার স্ত্রীও (প্রবেশ করবে) যে ইন্ধন বহন করে।

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

৫. তার গলায় পাকানো রশি।

ব্যাখ্যা

আবু লাহাব ছিল ইসলাম ও নবি করিম (স.)-এর শত্রু। সে সর্বদাই ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। এ সূরায় তার শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আবু লাহাব ছিল রাসুল (স.)-এর চাচা। মক্কা নগরীতে সে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। সে প্রচুর ধন-সম্পদেরও মালিক ছিল। কিন্তু এত কিছুও তার কোনো কাজে আসেনি। বরং দুনিয়াতেও আবু লাহাবের ধ্বংস। আর আখিরাতেও সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তার স্ত্রীও ছিল তারই মতো ইসলামের শত্রু। সেও রাসুল (স.)-কে কষ্ট দিত। সে রাসুল (স.)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। ফলে তার প্রতিও আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ রয়েছে এবং আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

২০২১

শিক্ষা

- রাসুলুল্লাহ (স.) ও ইসলামের বিরোধিতা খুবই মারাত্মক কাজ।
- এর ফলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের ধ্বংস অনিবার্য।
- দুনিয়ার মানসম্মান,ধন-সম্পদ ইসলামের এসব শত্রুকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী সূরা আল-লাহাবের শিক্ষাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১০

সূরা আল-ইখলাস (سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ)

সূরা আল-ইখলাস আল-কুরআনের ১১২তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৪টি। এ সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এ সুরার ফজিলত অত্যন্ত বেশি। মহানবি (স.) বলেছেন, এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)। অন্য একটি হাদিসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসুল (স.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি এ সুরাটি খুব ভালোবাসি। উত্তরে নবি করিম (স.) বললেন, এর ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। (জামি তিরমিযি)

শানে নুযুল

একবার মক্কার মুশরিকরা মহানবি (স.)-এর নিকট আল্লাহ তায়ালার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন। (জামি তিরমিযি)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল আল্লাহ তায়ালা কীসের তৈরি- স্বর্ণ, রৌপ্য না অন্য কিছুর? তাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এ সূরা নাজিল করেন।

শব্দার্থ

قُلْ - আপনি বলুন, তুমি বলো
هُوَ - তিনি, সে।
اَحَدٌ - একক, এক-অদ্বিতীয়।
اَلصَّمَدُ - অমুখাপেক্ষী, বে-নিয়ায, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ংসম্পূর্ণ।
لَمْ يَلِدْ - তিনি কাউকে জন্ম দেননি
لَمْ يُوْلَدْ - তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি
كُفُوًا - সমতুল্য, সাদৃশ্যপূর্ণ, সমকক্ষ।

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○۱

১. বলুন, (হে নবি!), তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○۲

২. আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, (সকলেই তার মুখাপেক্ষী)।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ○۳

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○۴

৪. আর তার সমতুল্য কেউই নেই।

ব্যাখ্যা

এ সূরা তাওহিদ বা একত্ববাদের সুপ্রসিদ্ধ দলিল। এ সূরায় সংক্ষিপ্তরূপে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এতে মুশরিক ও কাফিরদের বিশ্বাসের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবকিছু তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন এবং একাই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। বরং সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তার মুখাপেক্ষী। আর তার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। বিশ্বজগতে তার সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউই নেই।

শিক্ষা

- আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়।
- তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতামাতা কেউ নেই।
- তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান।
- তার সমকক্ষ কেউ নেই।

আমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করব। তার সাথে কাউকে শরিক করব না।

২০২৪

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা সূরা আল-ইখলাসের শিক্ষাগুলো লিখে একটি রঙিন পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১১

মুনাজাতমূলক আয়াত

আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও রক্ষক। তিনি অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি আমাদের আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য ইত্যাদি দান করেন। পৃথিবীর সকল নিয়ামত তারই দান। তিনি আমাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তার দয়া ও করুণাতেই আমরা দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা পাই। এককথায় সকল কিছু তারই অধীন। তার হুকুমেই সবকিছু পরিচালিত হয়। পার্থিব জীবনে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তাও তিনি দান করেন।

সুতরাং আমাদের উচিত তারই কাছে সবকিছুর জন্য প্রার্থনা করা। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন।' (জামি তিরমিযি)। আল্লাহ তায়ালার নিকট কিছু চাওয়ার মাধ্যম হলো মুনাজাত করা। মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের চাহিদা জানাতে পারি। আল-কুরআনে মুনাজাতমূলক বহু আয়াত রয়েছে। এ পাঠে আমরা এরূপ তিনটি মুনাজাতমূলক আয়াত শিখব। অতঃপর এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকট মুনাজাত করব।

আয়াত ১

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ২৩)

সর্বপ্রথম এ মুনাজাত হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে জান্নাতে বসবাস করতে নির্দেশ দেন। জান্নাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে সকল নিয়ামত ভোগ করার অনুমতি দেন। শুধু একটি নির্দিষ্ট গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেন। কিন্তু আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) শয়তানের প্ররোচনায় ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। তাঁদের এ কাজের জন্য মহান আল্লাহ বেহেশত থেকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। দুনিয়ায় এসে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন। তাঁরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের উপর্যুক্ত মুনাজাত শিক্ষা দেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এ মুনাজাতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দোয়া কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

এ আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুনাজাত। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা নানারকম পাপ করে থাকি। আমরা আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে থাকি। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত অপরাধসমূহ স্বীকার করা। অতঃপর এ মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাহলে আশা করা যায়

আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং আমাদের পাপ মাফ করে দেবেন।

আয়াত ২

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ○

অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ থেকে আমাদের প্রতি দয়া কর এবং আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা কর।" (সূরা আল-কাহ্ফ, আয়াত ১০)

মুনাজাতটি আসহাবে কাহফের যুবকগণ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহ্ফে তাঁদের ঘটনা ও মুনাজাত উল্লেখ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.)-এর আগমনের কয়েকশ বছর পূর্বের ঘটনা। দাকইয়ানুস নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। সে ইমানদারদের উপর খুব অত্যাচার করত। তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকজন যুবক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। তাঁদের সাথে একটি কুকুরও ছিল। তাঁদেরকে আসহাবে কাহ্ফ বলা হয়। তাঁরা গুহাতে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। গুহায় থাকাবস্থায় তাঁরা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করে এ মুনাজাত করেন। আল্লাহ তায়ালাও তাঁদের দোয়া কবুল করেন।

নেককার ও পুণ্যবানগণ কখনোই আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ত্যাগ করেন না। শত অত্যাচারেও তাঁরা যথাযথভাবে মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। এজন্য প্রয়োজনে নিজেদের ঘরবাড়ি, দেশত্যাগ করতেও পিছপা হন না। আমরাও তাঁদের মতো আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ছাড়ব না। বরং কোনো অসুবিধা দেখা দিলে আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব। ফলে তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমাদের সকল কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবেন।

আয়াত ৩

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।" (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

এ মুনাজাত করেছিলেন হযরত ইবরাহিম (আ.)। কাফিরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট এ মুনাজাত করেন।

বস্তুত, আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর মালিক। তার দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা কোনো কিছু করতে পারব না। সুতরাং সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সকল অবস্থায় আমরা আল্লাহ তায়ালার দয়ার উপর নির্ভর করব। সকল কাজে তাঁরই অভিমুখী হবো। তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাহায্য করবেন। উক্ত মুনাজাত আমাদের এ শিক্ষা প্রদান করে।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি অর্থসহ একে অন্যকে মুখস্থ বলবে।
বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখার জন্য সুন্দর করে লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

পাঠ ১২
আল-হাদিস (اَلْحَدِيْثُ)

হাদিস আরবি শব্দ। এর অর্থ কথা, বাণী ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায়, মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে হাদিস বলা হয়।

হাদিসের গুরুত্ব

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে বহু নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতেন। হাতে-কলমে পুণ্য ও ন্যায় কাজের শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির আদর্শ। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তাঁর পর আর কোনো নবি আসবেন না। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শই কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং তাঁর সকল কথা ও কর্ম সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। এগুলো জানার মাধ্যমেই আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারি। হাদিস শরিফ হলো নবি করিম (স.)-এর জীবনের সকল কাজ-কর্মের সংরক্ষক। এর মাধ্যমেই আমরা মহানবি (স.)-এর সকল নির্দেশনা ও শিক্ষা জানতে পারি।

যদি হাদিস শরিফ না থাকত, তবে আমরা এসব কিছু জানতে পারতাম না। সুতরাং পুণ্য ও ন্যায়ের পথে চলার জন্য হাদিস শরিফের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হাদিস ইসলামি জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস। আল-কুরআনের পরই হাদিসের স্থান। হাদিস আল-কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বহু নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মহানবি (স.) সেগুলো আমাদের সামনে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সেসব বিধান সাহাবিগণকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। হাদিস জানার মাধ্যমেই আমরা এগুলো জানতে পারি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

অর্থ : "রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশ্‌র, আয়াত ৭)

মানবজাতিকে সুপথে পরিচালিত করার বাস্তব নির্দেশনা রয়েছে হাদিসে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন-

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

অর্থ: আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যদি তা শক্তভাবে ধরে রাখো তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তার নবির সুন্নাহ বা হাদিস। (মুয়াত্তা মালিক)

২০২১

আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে হাদিসের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। অতএব, আমরা হাদিস শরিফ জানব এবং সে অনুযায়ী যথাযথভাবে আমল করতে চেষ্টা করব।

সিহাহ সিত্তাহ (اَلصِّحَاحُ السِّتَّةُ)

সিহাহ শব্দের অর্থ শুদ্ধ, সঠিক। আর সিত্তাহ শব্দের অর্থ ছয়। বিশুদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সহিহ্ হাদিসসমূহ এ ছয়টি গ্রন্থে একত্র করা হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে আমরা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে মহানবি (স.)-এর হাদিসসমূহ জানতে পারি।

নিম্নে আমরা উক্ত ছয়টি হাদিস গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানব :

১. সহিহ্ বুখারি

এ গ্রন্থের সংকলক হলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল বুখারি (র.)। তিনি ইমাম বুখারি নামে খ্যাত। তাঁর নামানুসারেই তাঁর সংকলিত কিতাবকে সহিহ্ বুখারি বলা হয়। তিনি সর্বমোট ছয় লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর কিতাব সংকলন করেন। সহিহ্ বুখারি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ। বলা হয়, কুরআন মজিদের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো সহিহ্ বুখারি।

২. সহিহ্ মুসলিম

এটি সিহাহ সিত্তাহর দ্বিতীয় গ্রন্থ। বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহিহ্ বুখারির পরই এর স্থান। এ গ্রন্থের সংকলক হলেন আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল কুশাইরি (র.)। তিনি তিন লক্ষ হাদিস থেকে বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করেন।

৩. জামি তিরমিযি

এ কিতাবের সংকলক আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযি (র.)। এ কিতাবে প্রায় সব বিষয়ের হাদিস সংকলন করা হয়েছে। এ কিতাব সম্পর্কে বলা হয়- 'যার ঘরে এ কিতাব থাকবে, মনে করা যাবে যে তার ঘরে নবি করিম (স.) আছেন এবং তিনি নিজে কথা বলছেন।'

৪. সুনানু আবু দাউদ

এ কিতাবের সংকলকের নাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনু আশআছ (র.)। এ কিতাবের বিন্যাস পদ্ধতি অত্যন্ত উন্নতমানের। সর্বমোট পাঁচ লক্ষ হাদিস যাচাই-বাছাই করে এ কিতাব সংকলন করা হয়।

৫. সুনানু নাসাই

এর সংকলক আহমদ ইবনু শুআইব আন-নাসাই (র.)। এর বিন্যাস পদ্ধতি উঁচুমানের। সিহাহ সিত্তাহের মধ্যে এ কিতাব খানার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

৬. সুনানু ইবনু মাজাহ

এটি সিহাহ সিত্তাহের সর্বশেষ কিতাব। এর সংকলকের নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ।

আমরা বড় হয়ে হাদিসের এসব কিতাব পড়ব। এগুলো থেকে প্রিয় নবি (স.)-এর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান-লাভ করব। অতঃপর এগুলোর শিক্ষা অনুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে হাদিসের গুরুত্ব বর্ণনা করবে।
বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ ও এগুলোর সংকলকগণের নাম নিজ খাতায় লিখে একটি চার্ট তৈরি করবে।

পাঠ ১৩

মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস

মুনাজাত হলো আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করা। মুনাজাত করার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার মহত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা যে ব্যক্তি দুর্বল, অসহায় সে-ই সাধারণত সাহায্য চায়। আর সাহায্যকারী স্বভাবতই ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর নিকট মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা আমাদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করি। সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালার অমুখাপেক্ষিতা, ক্ষমতা, দয়া ইত্যাদি গুণের স্বীকৃতি প্রদান করি। সুতরাং মুনাজাতও একপ্রকার ইবাদত। এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা খুশি হন। হাদিস শরিফে মুনাজাতমূলক বহু হাদিস রয়েছে। নিম্নে আমরা মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস জানব।

হাদিস ১

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى -

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হিদায়াত (সরল সঠিক পথের নির্দেশনা), তাকওয়া বা পরহেযগারি, পবিত্রতা ও অভাব-অনটন থেকে মুক্তি কামনা করছি।' (সহিহ্ মুসলিম ও জামি তিরমিযি)

হাদিস ২

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ -

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, আমাকে (সরল সঠিক) পথ দেখাও, আমাকে সুস্থ রাখ এবং আমাকে রিজিক দান কর।' (সহিহ্ মুসলিম)

হাদিস ৩

يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ -

অর্থ : 'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দীনের (ইসলামের) উপর দৃঢ় রাখ।' (জামি তিরমিযি)

দীনের উপর দৃঢ়-স্থির থাকা মুমিনের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। উল্লিখিত হাদিসে আল্লাহ তায়ালার নিকট এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

আমরা উপরিউক্ত মুনাজাতসমূহ শিখব। এগুলোর অর্থ জানব। অতঃপর এগুলোর দ্বারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করব। তাহলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন। আমাদের ক্ষমা করবেন এবং দয়া করবেন। এভাবে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিসের অর্থ একটি পোস্টারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৪

নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক তিনটি হাদিস

মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতা দুটি মহৎ গুণ। আমাদের সমাজে নানারকম লোকজন বসবাস করে। ধনী-গরিব, সাদা- কালো, সুস্থ-অসুস্থ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবরকমের লোকদের নিয়েই আমাদের সমাজ। সবাই এ সমাজের সদস্য। সবার মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সবার মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা না থাকলে কোনো সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। আর এর জন্য প্রয়োজন মানুষের প্রতি প্রীতি, দয়া-মায়া, ভালোবাসা। ইসলাম ধর্মে এগুলোর প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমাদের মহানবি (স.) নিজে সকল মানুষকে ভালোবাসতেন। জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকেই তিনি ভালোবাসতেন, সবার প্রতি দয়া করতেন। আমাদের তিনি এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস শরিফে আমরা তাঁর এসব নির্দেশ দেখতে পাই।

আমাদের সমাজে মুসলমানগণের পাশাপাশি অমুসলিমগণও বসবাস করে। তারাও আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। তাঁদের প্রতিও সদাচরণ করতে হবে। তাঁদের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি কোনোরূপ ঠাট্টা-তামাশা করা যাবে না। তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে দিতে হবে। এটাই হলো মহানবি (স.) ও দীন ইসলামের শিক্ষা। হাদিস শরিফে এ সম্পর্কেও আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ পাঠে আমরা মানবপ্রেম ও পরমতসহিষ্ণুতা-সংক্রান্ত তিনটি হাদিস জানব।

হাদিস ১

لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ -

অর্থ : 'যে মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তায়ালাও তার প্রতি দয়া করেন না।'(সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)

শিক্ষা

পৃথিবীর সকল মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি। সকলের প্রতিই সদাচার করতে হবে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি দয়া-মায়া, ভালোবাসা দেখাতে হবে। এমন যেন না হয় যে আমরা শুধু ধনীদের ভালোবাসব, গরিবদের ভালোবাসব না। তদ্রূপ অমুসলিমদেরকে বাদ দিয়ে শুধু মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও ঠিক নয়। বরং প্রয়োজন অনুসারে সকলের প্রতিই দয়া, ভালোবাসা ও সহযোগিতা করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন এবং আমাদের প্রতি দয়া করবেন। সকল মানুষকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করাই এ হাদিসের শিক্ষা।

হাদিস ২

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ -

অর্থ : 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)

শিক্ষা

আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। মা-বাবা, ভাই-বোন, খালা-খালু, ফুফু-ফুফা, দাদা-দাদি, নানা-নানি সকলেই আমাদের আত্মীয়। তারা আমাদের একান্ত আপনজন। এছাড়া আমাদের আরও বহু আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। সকলের সাথেই আমরা সম্পর্ক রক্ষা করে চলব। কারো সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করব না।

আত্মীয়-পরিজন যদি অমুসলিমও হন তাঁদের সাথেও সম্পর্ক ত্যাগ করা যাবে না। বরং তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সদাচার করতে হবে। প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। বিপদে-আপদে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমরা সকল আত্মীয়ের সাথে সুন্দর সম্পর্ক রাখব। তবেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।

হাদিস ৩

اَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থ : 'সাবধান! কেউ যদি কোনো যিম্মির প্রতি যুলুম করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতাবহির্ভূত কোনো কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার থেকে কোনো মালামাল নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার (যিম্মির) পক্ষ অবলম্বন করব।' (আবু দাউদ)

শিক্ষা

মুসলিম-অমুসলিম সকলেই এ দেশের নাগরিক। মুসলিম-অমুসলিমগণের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অত্যাচার করা যাবে না।

তাদের ধর্ম, জীবন, ধন-সম্পদ, সম্ভ্রম ইত্যাদির ক্ষতি করা যাবে না। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মপালনে তাদের কোনোরূপ বাধা দেওয়া যাবে না। তাদের ধর্ম নিয়ে কোনোরূপ অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে। কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করলে, কষ্ট দিলে স্বয়ং নবি করিম (স.) কিয়ামতের দিন আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন না। আর মহানবি (স.) কারো পক্ষে সুপারিশ না করলে তার ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং আমরা সকল মানুষকে ভালোবাসব। কাউকে কষ্ট দেবো না, কারো প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন করব না। সমাজের সকলকে ধর্ম পরিচয়ে নয়, মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে সকলের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখব।

বাড়ির কাজ : শিক্ষার্থী এ পাঠে উদ্ধৃত হাদিস তিনটি অর্থসহ মুখস্থ বলবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মাদ্দের হরফ কয়টি?

ক. ৩টি খ. ৬টি
গ. ১৪টি ঘ. ১৫টি

২. তোমরা কুরআন পাঠ কর, কেননা কুরআন পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে। হাদিসের উদ্দেশ্য–

i. কুরআন পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা করা
ii. তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত করা
iii. নিজে কুরআন শিক্ষা করা ও অপরকে শেখানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

এরফান নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু তার তিলাওয়াত শুদ্ধ হয় না। একবার نُوحٌ (নুহুন) শব্দ তিলাওয়াতের সময়ে نْ (নুন) বর্ণকে টেনে পড়েনি।

৩. এরফান এক্ষেত্রে কি ত্যাগ করেছে?

ক. ওয়াকফ খ. মাদ্দ

গ. মাখরাজ ঘ. সিফাত

৪. এরফানের এ জাতীয় তিলাওয়াতে —

i. সালাত শুদ্ধ হবে না

ii. অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে

iii. গুনাহ হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নাবিহা প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করে। মেয়ের তিলাওয়াত শোনার জন্য বাবা মাওলানা আহমাদ সাহেব নাবিহার কাছে বসলেন। নাবিহা তিলাওয়াত শুরু করল। তিলাওয়াতের সময়ে مٓ (মিম) চিহ্নে বিরতি দেয়নি, فِيْهِ (ফিহা) তিলাওয়াতের সময়ে ف বর্ণ এবং ه বর্ণ (তাজবিদ অনুযায়ী) সঠিক নিয়মে পড়েনি। মেয়েকে উদ্দেশ্য করে নাবিহার বাবা বললেন, কুরআন তিলাওয়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন।

(ক) মাখরাজ কী?

(খ) নাযিরা তিলাওয়াত বলতে কী বোঝায়?

(গ) নাবিহা দ্বিতীয় পর্যায়ে তাজবিদের কোন নিয়মটি ত্যাগ করেছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) নাবিহাকে তাঁর বাবা যে বিষয়টির প্রতি তাগিদ দিয়েছেন তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২। আকরাম সাহেব একজন বিশিষ্ট সমাজপতি। একদিন তার অসুস্থ প্রতিবেশী মনির মিয়া চিকিৎসার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য চাইলে তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দেন। অপরদিকে আকরাম সাহেবের বন্ধু আফজাল সাহেব তার অসহায় ফুপাতো বোনের বিয়ের যাবতীয় খরচ বহন করেন।

(ক) সিহাহ সিত্তাহ কী?
(খ) মানবপ্রেম একটি মহৎ গুণ- ব্যাখ্যা কর।
(গ) সাহায্য প্রার্থী মনির মিয়ার প্রতি আকরাম সাহেবের আচরণে কী লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) আফজাল সাহেবের কাজটি পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (اَلْأَخْلَاقُ)

আখলাক আরবি শব্দ। এর অর্থ চরিত্র, স্বভাব, আচার-আচরণ, ব্যবহার ইত্যাদি। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব আচার, ব্যবহার, চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায়, সেসবের সমষ্টিই হলো আখলাক। এককথায় মানবচরিত্রের সব দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। মানবচরিত্রের সৎ ও অসৎ দিকগুলোর বিচারে আখলাককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আখলাকে হামিদাহ্ (প্রশংসনীয় আচরণ) এবং আখলাকে যামিমাহ্ (নিন্দনীয় আচরণ)

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- সদাচরণের পরিচয় ও কতিপয় সদাচরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অসদাচরণের পরিচয় ও এর কুফল বর্ণনা করতে পারব।
- ইসলামের দৃষ্টিতে ইভটিজিং (যৌন হয়রানি) ও ছিনতাইয়ের (রাহাজানি) নেতিবাচক প্রভাব এবং প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১

আখলাকে হামিদাহ্ (اَلْأَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ)

মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব উত্তম আচার, ব্যবহার, চালচলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায়, সেসবের সমষ্টিকে আখলাকে হামিদাহ্ বা উত্তম চরিত্র বলা হয়। যেমন- পরোপকারিতা, শালীনতাবোধ, সৃষ্টির সেবা, আমানত রক্ষা, শ্রমের মর্যাদা, ক্ষমা ইত্যাদি।

আখলাকে হামিদাহ্র গুরুত্ব

মানবজীবনে আখলাকে হামিদাহ্র (উত্তম চরিত্রের) গুরুত্ব অপরিসীম। মানবজীবনের সুখ-শান্তি আখলাকে হামিদাহ্ বা প্রশংসনীয় আচরণের উপর নির্ভরশীল। প্রশংসনীয় আচরণের মাধ্যমেই উত্তম চরিত্র গড়ে ওঠে। আখিরাতের সুখ-দুঃখও আখলাকে হামিদাহ্র উপর নির্ভর করে। যার স্বভাব-চরিত্র যত সুন্দর হবে, সে ততই সৎকর্মশীল হবে এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় হবে।

আখলাকে হামিদাহ্র সুফল

১. মহান আল্লাহ ও তার রাসুল (স.)-এর ভালোবাসা লাভ

উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে মহান আল্লাহ ও তার রাসুল (স.)-এর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়, যার চরিত্র সর্বোত্তম।' (বুখারি ও মুসলিম)

২. ইমানের পূর্ণতা অর্জন

উত্তম চরিত্র মানুষের ইমানকে পূর্ণতা দান করে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا -

অর্থ : 'চরিত্রের বিচারে যে উত্তম, মুমিনদের মধ্যে সেই পূর্ণতম ইমানের অধিকারী।' (আবু দাউদ)

৩. সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুল (স.)–এর নিকট উঁচু মর্যাদা লাভ করেন এবং সমাজের নিকটও উঁচু মর্যাদার অধিকারী হন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যার চরিত্র উত্তম।' (বুখারি)

৪. কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ভারি আমল

মহানবি (স.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন যে জিনিসটি মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি হবে তা হলো উত্তম চরিত্র।' (আবু দাউদ)

দলগত কাজ : আখলাকে হামিদাহ্‌র সুফলগুলো উল্লেখ কর।
বাড়ির কাজ : সদাচারণের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ ২

পরোপকার (اَلْاِحْسَانُ)

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। আর সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হলে পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন। অন্যের প্রয়োজনে বা উপকারে আসার নামই হলো পরোপকার।

পরোপকারের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'ইহসান' اَلْاِحْسَانُ, যার অর্থ অন্যের উপকার করা। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সেগুলোকে উত্তম বা যথাযথভাবে পালন করার নামই পরোপকার।

তাৎপর্য

পরোপকার মহান আল্লাহর একটি বড় গুণ। মহান আল্লাহ পরম দয়ালু। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি তার এ অসীম দয়া ও করুণা বিরাজমান। তিনি সকল মানুষকে সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। এ কারণে মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই মানুষ সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী অপরের উপকার করতে হবে।

পরোপকারের সুফল

১. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ

পরোপকারী ব্যক্তিদের আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ○

অর্থ : "তোমরা সৎকর্ম ও পরোপকার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীল ও পরোপকারীদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত -১৯৫)

২. সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়

পরোপকারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পদ ব্যয় করে বা ভালো কথা বলেও মানুষের উপকার করা যায়। এতে সমাজ থেকে ঝগড়া-ফাসাদ দূর হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. শত্রু মিত্রে পরিণত হয়

পরম শত্রুকেও পরোপকারের মাধ্যমে আপন করা যায়। কঠোর হৃদয়বিশিষ্ট লোকের অন্তরও জয় করা যায়।

৪. আল্লাহর রহমত লাভ

আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি দয়া করলে তিনি দয়াকারী ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর হাদিস–

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ -

অর্থ : 'তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)

৫. মানুষের ভালোবাসা অর্জন

দয়া বা পরোপকারের মাধ্যমে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক বন্ধন মজবুত হয়। কঠিন হৃদয়ের মানুষকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। পরম শত্রুও মিত্রতে পরিণত হয়।

আমরা সর্বদা সৃষ্টির সেবা করব। বিপদে-আপদে অপরের সাহায্য করব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে মানুষকে কীভাবে উপকার করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৩

শালীনতাবোধ (اَلتَّهْذِيْبُ)

শালীনতার আরবি প্রতিশব্দ 'তাহযিব' (اَلتَّهْذِيْبُ), যার অর্থ ভদ্রতা, নম্রতা ও লজ্জাশীলতা। আচার-আচরণে, কথাবার্তায়, বেশভূষায় ও চালচলনে মার্জিত পন্থা অবলম্বন করাকে শালীনতা বলে।

গুরুত্ব

শালীনতা মানুষের একটি মহৎগুণ। এটির গুরুত্ব অপরিসীম। শালীনতাবোধ মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। শালীনতা আল্লাহর অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করে। আচার-ব্যবহারে শালীন ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করে। শালীন পোশাক-পরিচ্ছদ সৌন্দর্যের প্রতীক। শালীন ও ভদ্র আচরণের মাধ্যমে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে শালীনতার প্রয়োজন সর্বাধিক। শালীনতাপূর্ণ আচার-ব্যবহার সম্প্রীতি ও সৌহার্দের চাবিকাঠি। অশোভন বা অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ অনেক সময় সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে, সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে। নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়।

শালীনতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে অভদ্র বা অশালীন আচরণ বন্ধুকেও দূরে ঠেলে দেয়। মানুষ অশালীন ব্যক্তিকে পছন্দ করে না। তার সাহচর্য পরিত্যাগ করে। মহানবি (স.) বলেন, "মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।' (বুখারি) অশালীন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কখনোই পছন্দ করেন না। বরং অশালীন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর বাণী :

اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ -

অর্থ : 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।' (তিরমিযি)

শালীনতা মানুষের জীবনে অপরিহার্য বিষয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে শালীনতা শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা লুকমানে উল্লেখ আছে যে, হযরত লুকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে শালীনতা শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

"হে পুত্র, অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলো না, কারণ আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। তুমি পদচারণ করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বর সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।" (সূরা লুকমান, আয়াত ১৯)

শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শালীনতা অবলম্বন করে চলা উচিত। এতে জীবন সুন্দর ও মধুময় হয়ে ওঠে। সমাজেও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে শালীন আচরণের সুফলগুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।
বাড়ির কাজ : 'অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ বিপর্যয় ডেকে আনে।' - ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ৪

সৃষ্টির সেবা (خِدْمَةُ الْخَلْقِ)

ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল হয়ে আদর-যত্ন করার নামই হলো সৃষ্টির সেবা। মহান আল্লাহ এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা করে পাঠিয়েছেন। আর সৃষ্টিকুলের সবকিছু যেমন- জীবজন্তু, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ইত্যাদি মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এসব সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং এগুলোর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য।

গুরুত্ব

যে সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে, আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়ে রহমত বর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاۤءِ -

অর্থ : 'তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)

পৃথিবী ও এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর সৃষ্টি। সৃষ্টিজগতের সবকিছু নিয়ে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবার। আল্লাহর সৃষ্টি পরিবারে মানুষই সেরা সৃষ্টি। পরিবারে যেমন পরিবার প্রধানের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে, তেমনি সৃষ্টিজগতের প্রতিও মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সৃষ্টিকুলের প্রতি এ দায়িত্ব পালন করার নাম সৃষ্টির সেবা।

মানুষের উপর প্রধানত দুই ধরনের কর্তব্য রয়েছে। প্রথমত স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য, তারপর সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য। সৃষ্টির প্রতি মানুষের কর্তব্যগুলোর মধ্যে অসহায় ও দুস্থ মানুষকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা যেমন কর্তব্য, তেমনি গাছপালা, পশু-পাখি, বৃক্ষলতা এবং পরিবেশের প্রতিও মানুষের কর্তব্য রয়েছে। সৃষ্টির প্রতি সদয় হলে এবং এদের লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে আল্লাহ খুশি হন। তেমনি এদের প্রতি অবহেলা করলে, নিষ্ঠুর আচরণ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

আমাদের চার পাশের কীটপতঙ্গ, গাছপালা, তরুলতা, পশু-পাখি সবকিছুর প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। কারণ এ সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। আমাদের স্বার্থেই এ পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। মহান আল্লাহ এ সবকিছু আমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের প্রিয় নবি (স.) সৃষ্টিজীবের প্রতি সর্বদা সদয় ছিলেন। সমাজে কোনো ব্যক্তি পীড়িত হলে তার সেবা করতে হবে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে সমাজে একে অপরের সেবা ও সাহায্য করলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া যায়। প্রিয় নবি (স.) বলেছেন, 'যে মুসলমান অন্য মুসলমান ভাইয়ের অভাব মোচন করে আল্লাহ তায়ালা তার অভাব দূর করেন।' (মুসলিম)

গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণীরই আমাদের ন্যায় ক্ষুধা ও পিপাসা আছে। এদেরকে খেতে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

মহানবি (স.) বলেন, 'কোনো এক মহিলা একটি বিড়াল বেঁধে রাখে। সে বিড়ালটিকে খেতে দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি বাঁধা অবস্থায় খাদ্যাভাবে মারা গেলে আল্লাহ ঐ মহিলাকে শাস্তি দেন। (বুখারি ও মুসলিম)

প্রিয় নবি (স.) আরও বলেন, 'বনি ইসরাইলের এক পাপী মহিলা একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পিপাসায় কাতর দেখে পানি পান করায়। এতে আল্লাহ তায়ালা ঐ মহিলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন।' (বুখারি ও মুসলিম)

জীবজন্তুর মতো উদ্ভিদের প্রতিও সদয় হতে হবে। অকারণে গাছ কাটা উচিত নয়। গাছের পাতা ছেঁড়া বা চারাগাছ উপড়ে ফেলাও উচিত নয়। গাছপালার যত্ন করা উচিত। বৃক্ষলতাও মহান আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। পরিবেশ রক্ষায় ও নিজেদের প্রয়োজনে জীবজগৎ ও পরিবেশের প্রতি সদাচরণ করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আমরা সৃষ্টির সেবা করব, জীবজন্তুকে কষ্ট দেবো না। অকারণে কোনো বৃক্ষের ক্ষতি করব না। বৃক্ষ রোপণ করব এবং এর যত্ন করব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সৃষ্টির সেবামূলক কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

আমানত (اَلْأَمَانَةُ)

আমানত অর্থ গচ্ছিত রাখা বা দায়িত্বে রাখা। গচ্ছিত বা দায়িত্বে রাখা বস্তু সযত্নে রেখে এর মালিকের কাছে যথাযথভাবে ফেরত দেওয়াকে আমানত রক্ষা বলে। যিনি আমানত রক্ষা করেন, তাকে আমানতদার বলে। আমানতের মাল নষ্ট করা বা আত্মসাৎ করার নাম খেয়ানত করা। আর আত্মসাৎকারীকে খেয়ানতকারী বলে।

গুরুত্ব

সমাজের প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ দায়িত্ব তার নিকট পবিত্র আমানত। সামাজিক শান্তি রক্ষার জন্য আমানত রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি আমানত রক্ষা করেন, তাকে সবাই বিশ্বাস করে এবং ভালোবাসে। সমাজের সবাই তাকে মর্যাদা দেয়। আমানতের খেয়ানতকারীকে সমাজের কেউ পছন্দ করে না এবং বিশ্বাসও করে না। বরং তাকে সবাই ঘৃণা করে। আমানত রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۙ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা যেন আমানতসমূহ তার মালিককে যথাযথভাবে ফেরত দাও।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৮)

আমানত রক্ষা করা ইমানের অঙ্গ। এ ব্যাপারে মহানবি (স.) বলেন,

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَّا أَمَانَةَ لَهٗ -

অর্থ : 'যার আমানতদারি নেই,তার ইমানও নেই।' (বায়হাকি)

আমানতের খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ।

মহানবি (স.) বলেন,

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ -

অর্থ : 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে,আমানতের খেয়ানত করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

আমানতের খেয়ানতকারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ঘৃণিত। মানুষের কাছেও ঘৃণিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী :

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।"(সূরা আল-আনফাল, আয়াত ৫৮)

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক আলোচনা করে আমানত রক্ষার কয়েকটি ক্ষেত্রের তালিকা প্রস্তুত করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৬

শ্রমের মর্যাদা (شَرَفُ الْعَمَلِ)

মানুষ জীবনধারণের জন্য যেসব কাজ করে তাকে শ্রম বলে। মানুষ তার নিজের বেঁচে থাকার, অপরের কল্যাণের এবং সৃষ্টি জীবের উপকারের জন্য যে কাজ করে তা-ই শ্রম। মানুষের উন্নতির চাবিকাঠিই হলো শ্রম। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নত। শ্রমের ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

অর্থ : "অতঃপর যখন নামায শেষ হবে তখন তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ (রিজিক) অন্বেষণ করবে।" (সূরা আল-জুমুআ, আয়াত ১০)

শ্রমের মর্যাদা

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক। শ্রম দ্বারা অর্জিত খাদ্যকে ইসলাম উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণকে ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ-

অর্থ : 'ফরজ ইবাদতের পর হালাল রুজি উপার্জন করা একটি ফরজ ইবাদত।' (বায়হাকি)

মানুষের কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে অফুরন্ত সম্পদ রেখেছেন। এ সম্পদগুলো আহরণ করতে হলে প্রয়োজন হয় শ্রমের। শ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোও আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টিগতভাবেই দান করেছেন। এগুলো হচ্ছে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা হাত, পা ও মস্তিষ্ক। এগুলোকে কাজে লাগাতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- "তিনি তো তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেওয়া রিযিক থেকে আহার কর।" (সূরা আল-মুল্ক, আয়াত ১৫)

আমাদের প্রিয় নবি (স.) শ্রমকে ভালোবাসতেন। তিনি নিজেও শ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি শিশু বয়সে মেষ চরাতেন। বড় হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। হিজরতের পর মদিনার জীবনে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে তিনি পরিখা খননে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরিশ্রমী ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন।

মহানবি (স.) আরও বলেন, 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নাই। আল্লাহর নবি দাউদ (আ.) নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।' (বুখারি)

প্রিয় নবি (স.)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা ঘোরাতেন। আর এজন্য তাঁর হাতে জাঁতা ঘুরানোর দাগ পড়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে তিনি নিজেই পানির মশক বয়ে আনতেন। এতে তাঁর বুকে দড়ির দাগ পড়েছিল। ঘরের সকল কাজ তিনি নিজে করতেন। নিজে ঝাড়ু দিতেন। সাহাবিগণ একদিন নবি করিম (স.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, কোন প্রকার উপার্জন উত্তম? নবি করিম (স.) জবাবে বলেন, 'মানুষের নিজ হাতের কাজের বিনিময় এবং সৎ ব্যবসায় থেকে প্রাপ্ত মুনাফা।' (সুনানে আহমাদ)

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে এবং তাঁর সাহাবিগণ জীবিকার জন্য পরিশ্রম করতে লজ্জাবোধ করতেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা শ্রমজীবীদের প্রশংসায় বলেন, "এমন বহুলোক আছে যারা জমিনের দিকে ভ্রমণ করে ও আল্লাহর অনুগ্রহ খুঁজে বেড়ায়।" (সূরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত ২০)

ইসলামে শ্রমিকের মজুরি সাথে সাথে আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'মজুরের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি আদায় করে দেবে।' (বায়হাকি)

সুতরাং আমরা সবাই শ্রমের প্রতি মর্যাদাশীল হবো, নিজেদের কাজ নিজেরাই করব এবং আমরা নিজেরা স্বাবলম্বী হবো।

দলগত কাজ : কী কী কাজ শিক্ষার্থী নিজেরা করতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৭
ক্ষমা (اَلْعَفْوُ)

মহান আল্লাহর অন্যতম গুণ ক্ষমা। সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য মানুষের এ গুণটি থাকা খুবই প্রয়োজন।

ক্ষমার আরবি প্রতিশব্দ 'আফউন' (عَفْوٌ)-এর অর্থ মাফ করা, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। ইসলামি পরিভাষায় এর অর্থ হলো প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নিয়ে মাফ করে দেওয়া।

গুরুত্ব

মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষকে অনেক নিয়ামত দান করেছেন। মানুষের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানুষ তার অজ্ঞতার কারণে সেই সর্বশক্তিমান প্রভুর কথা ভুলে যায়, তার হুকুম অমান্য করে, তার সাথে অংশীদার স্থাপন করে। পরে যখন মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়,তখন আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহর ঘোষণা "তিনিই তার বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন।" (সূরা আশ-শুরা, আয়াত ২৫)

আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ তার রাসুল (স.)-কে ক্ষমার নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝

অর্থ : "আপনি ক্ষমা করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৯৯)
মহান আল্লাহ আরও বলেন,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

অর্থ : "অতএব,আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" (সূরা আলে- ইমরান, আয়াত ১৫৯)

যেসব মানুষ আল্লাহ এবং তার দেওয়া বিধান অমান্য করে, পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ সেসব বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।

ক্ষমার ব্যাপারে মহান রাব্বুল আলামিনের নীতি ও আদর্শ আমাদের অনুসরণ করা আবশ্যক। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, কোনো কাজে বা কথায় তার ভুলত্রুটি হয়ে যেতে পারে। অতএব,অন্যের ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে আমাদের দেখা উচিত।

মানুষকে ক্ষমা করলে আল্লাহ খুশি হন এবং যে ক্ষমা করে আল্লাহ তার গুনাসমূহ ক্ষমা করে দেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অর্থ : "আর যদি তুমি তাঁদের মার্জনা কর, তাঁদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে জেনে রেখো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"(সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত ১৪)

মহানবি (স.) ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। একবার এক ইহুদি মহিলা প্রিয় নবি (স.)-কে তার বাড়িতে দাওয়াত দেন এবং বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত তাঁকে খেতে দেন। রাসুল (স.) উক্ত গোশতের কিছু খেতেই বিষক্রিয়া অনুভব করেন। পরে ঐ মহিলা গোশতে বিষ দেওয়ার কথা স্বীকার করে। কিন্তু প্রিয় নবি (স.) তাকে ক্ষমা করে দেন। এমনিভাবে মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স.) প্রাণের শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত স্বাধীন।' পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ক্ষমার উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি নেই। অপরাধীকে ক্ষমা করলে অপরাধী লজ্জিত হয়ে অপরাধ ছেড়ে দেয়। শত্রুকে ক্ষমা করলে শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়। আমরা অন্যকে ক্ষমা করব। অন্যকে ভালোবাসব।

একক কাজ : শিক্ষার্থীরা ক্ষমার ছোট ছোট ঘটনা যা নিজের জীবনে ঘটেছে, তা নিজের ভাষায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

বাড়ির কাজ : ক্ষমার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ ৮

অসদাচরণ (اَلْاَخْلَاقُ السَّيِّئَةُ)

এমন কিছু আচরণ বা কাজ যা মানুষকে হীন, নিচু ও নিন্দনীয় করে তোলে, সেগুলোকে আখলাকে যামিমাহ্ বা নিন্দনীয় আচরণ বলে। নিন্দনীয় আচরণগুলো হচ্ছে হিংসা, ক্রোধ, লোভ, প্রতারণা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, ইভটিজিং, ছিনতাই প্রভৃতি। এ নিন্দনীয় আচরণগুলো মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে কলুষিত করে। এ চরিত্রের অধিকারীকে মানুষ ঘৃণা করে। ইহকাল ও পরকালে সে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হবে। জাহান্নামের নিম্নস্তরে পৌঁছে যাবে। (তাবারানি)

আখলাকে যামিমাহ্‌র কুফল

১. ঘৃণার পাত্র

হীন বা মন্দ চরিত্রের লোকেরা সমাজের কাছে যেমনিভাবে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়, তেমনিভাবে পরিবারের কাছেও ঘৃণিত হয়। পরকালেও সে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, 'বান্দা তার কুচরিত্রের কারণে জাহান্নামের নিম্নস্তরে পৌঁছে যাবে।' (তাবারানি)

২. জান্নাত থেকে বঞ্চিত

মন্দ চরিত্রের লোকেরা পরকালে জান্নাত লাভ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ -

অর্থ : 'দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (আবু দাউদ)

চরিত্র সংশোধন ব্যতীত আত্মার সংশোধন সম্ভব হয় না। এজন্য চারিত্রিক দুর্বলতার সব দিকগুলোর সংশোধন করা আবশ্যক।

> **দলগত কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অসদাচরণের কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৯

হিংসা (اَلْحَسَدُ)

অন্যের সুখ-সম্পদ, মানসম্মান নষ্ট হওয়ার কামনা এবং নিজে এর মালিক হওয়ার বাসনা করাকে হিংসা বলে। হিংসা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ 'হাসাদুন' (حَسَدٌ), যার অর্থ হিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি।

অপকারিতা

হিংসা একটি মারাত্মক মানসিক ব্যাধি। হিংসা বহু কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন : শত্রুতা, লোভ, অহংকার, নিজের অসৎ উদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, নেতৃত্বের লোভ ইত্যাদি। এসব কারণে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ করে থাকে। ইসলাম এ কাজগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছে। হিংসার অপকারিতা সীমাহীন। হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা দেখে ইবলিস তাঁর প্রতি হিংসা করে। ফলে সে অভিশপ্ত হয়। আল্লাহ তায়ালার দয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

মানব সৃষ্টির পর হিংসার কারণেই সর্বপ্রথম পাপ সংঘটিত হয়। আদম (আ.)-এর পুত্র কাবিল হিংসার বশবর্তী হয়ে তারই আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। হিংসা মানুষের ভালো কাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেছেন,

২০২৫

إِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ -

অর্থ : 'আগুন যেমন শুকনা কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়, হিংসা তেমনই পুণ্যকে ধ্বংস করে দেয়।' (ইবনু মাজাহ)

হিংসা মানুষের শান্তি বিনষ্ট করে। মনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখে। হিংসুক ব্যক্তি আল্লাহ এবং মানুষের কাছে ঘৃণিত। কেউ তাকে ভালোবাসে না। কেউ তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না। সমাজের লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে। হিংসা সমাজে ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি এবং অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি হয়। অহংকার মানুষের পতন ঘটায়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে হিংসা থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

অর্থ : "আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে।" (সূরা আল-ফালাক, আয়াত ৫)

আল্লাহ তায়ালা হিংসা বর্জনকারীকে ভালোবাসেন। হিংসা বর্জনকারী জান্নাত লাভ করবেন। প্রিয় নবি একবার তাঁর এক সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দেন। তিনি কী আমল করেন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে কোনো উত্তম বস্তু দান করেছেন আমি তার প্রতি কখনোই হিংসা পোষণ করি না। (ইবনু মাজাহ)

আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিৎ 'আমরা হিংসা করব না। নিজের ক্ষতি করব না। সমাজের শান্তি বিনষ্ট করব না।'

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে হিংসার কুফলের তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১০

ক্রোধ (اَلْغَضَبُ)

'ক্রোধ' এর আরবি প্রতিশব্দ 'গাদাব'(غَضَبٌ), যার অর্থ রাগ। স্বীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়া বা কারো দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় মানুষের মনের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তাকে ক্রোধ বলে। অহংকার, তিরস্কার, ঝগড়া প্রভৃতি কারণে ক্রোধের সৃষ্টি হয়।

ক্রোধ ও রাগের ফলে মানুষ অনেক নির্দয় ও অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ড করে ফেলে। পরবর্তিতে এর কারণে লজ্জিত ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়। তাই মুসলমানদের উচিত ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করা। এ বিষয়ে মহানবি (স.) বলেন,

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - ২০২৩

অর্থ : 'শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে খুব কুস্তি লড়তে পারে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।' (বুখারি ও মুসলিম)

অপকারিতা

ক্রোধ একটি নিন্দনীয় বিষয়।এটি মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আর হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহ শেষ করে দেয়। ক্রোধের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। ক্রোধ মানুষের ইমানকে ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'সিরকা মধুকে যেভাবে বিনাশ করে, ক্রোধও ইমানকে তদ্রূপ নষ্ট করে।' (বায়হাকি)

ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রিয় নবির সাহাবি হযরত ইবনু উমার (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে জানতে চাইলেন, এমন কোনো কাজ আছে যা আল্লাহ তায়ালার গযব থেকে রক্ষা করবে? রাসুল (স.) বলেন, 'তুমি রাগ করবে না।' (তাবারানি)

ক্রোধ সংবরণ করা একটি পুণ্যের কাজ। রাসুল (স.)-এর এক সাহাবি একবার রাসুল (স.)-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে একটি ভালো কাজের নির্দেশ দিন।' প্রিয় নবি (স.) তাকে বললেন 'তুমি রাগ করবে না।' (বুখারি)

মহানবি (স.) বলেছেন, 'ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে, শয়তান আগুনের তৈরি। আর আগুনকে পানি ঠান্ডা করে। যদি কারো রাগ হয়, তবে তার উচিত ওযু করে নেওয়া।' (বুখারি ও মুসলিম)

দলগত কাজ :	শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ক্রোধ পরিহারের উপায়গুলো বের করবে এবং পোস্টারে লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।
বাড়ির কাজ :	'ক্রোধ একটি নিন্দনীয় বিষয়'—ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ১১

লোভ (اَلْحِرْصُ)

লোভ-এর আরবি প্রতিশব্দ 'হিরছুন' (حِرْصٌ), এর অর্থ লালসা, লিপ্সা, মোহ, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ইত্যাদি। অধিক পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে লোভ বলে। যেমন: অর্থ-সম্পদের লোভ, পদমর্যাদার লোভ, খাদ্যদ্রব্যের লোভ, পোশাক-পরিচ্ছদের লোভ ইত্যাদি।

লোভের কুফল

লোভ মানুষের মনের শান্তি বিনষ্ট করে। অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে সারাক্ষণ বিভোর রাখে। ফলে নিজের কাছে যা আছে তাতে তুষ্ট না থেকে আরও পাওয়ার আশায় সে অস্থির থাকে।

লোভ মানুষকে নানা প্রকার অপরাধমূলক কাজের দিকে ধাবিত করে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, কালোবাজারি, মজুদদারি, দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া, সুদ-ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ লোভের কারণেই সংঘটিত হয়।

লোভী ব্যক্তি অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং অবৈধ উপায়ে তা হস্তগত করার চেষ্টা করে। ইসলাম এরূপ লোভকে নিষিদ্ধ করেছে। প্রিয় নবি (স.) বলেছেন, 'তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এই জিনিসই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে এবং পরস্পরকে রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে উস্কে দিয়েছে। আর এই লোভ-লালসার কারণেই তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।' (সহিহ্ মুসলিম)

খাদ্যের প্রতি লোভে অনেকে মাত্রাতিরিক্ত খায়। এতে সে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আবার কখনো তা তার জীবন নাশেরও কারণ হয়। আর তাই কথায় বলে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

লোভ থেকে বাঁচার উপায়

ধৈর্য এবং অল্পে তুষ্টির গুণ থাকলে লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকা যায়। রাসুল (স.) বলেছেন, 'ইমান এবং লোভ এক অন্তরে একত্রিত হতে পারে না, কেননা ইমানের পরিনাম হচ্ছে ধৈর্য, তাওয়াক্কুল এবং অল্পে তুষ্ট থাকা।' (নাসাই ও তিরমিযি)

তকদিরের উপর বিশ্বাস রাখা লোভ দমনের প্রধান উপায়। মহানবি (স.) বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা চাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর। কেননা বান্দার ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে তার অতিরিক্ত সে পাবে না।' (হাকিম)

জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সহজ-সরল পথ অবলম্বন করলে লোভ বর্জন করা সম্ভব হয়। আমরা লোভের কুফল জানব। লোভ বর্জন করব। তকদিরে বিশ্বাস করব। অল্পে তুষ্ট থাকব। নিজেরা সুখে থাকব। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে লোভের কুফল আলোচনা করে লোভ বর্জনের উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১২

প্রতারণা (اَلْغَشُّ)

প্রতারণার আরবি প্রতিশব্দ 'আল-গাসশু' (اَلْغَشُّ) যার অর্থ ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা। কথাবার্তা, আচার-আচরণ, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধোঁকা দেওয়াকে প্রতারণা বলে। পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে বিক্রি করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদি প্রতারণার অন্তর্ভুক্ত।

কুফল

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতারণা একটি মানবতাবিরোধী অতি গর্হিত কাজ। এটি মিথ্যার শামিল। ইসলাম সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণকে সমর্থন করে না। কুরআন মজিদে ঘোষণা করা হয়েছে,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

অর্থ : "তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ করো না এবং জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করো না।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৪২)

প্রতারণা একটি সামাজিক অপরাধ। কারণ এর ফলে মানুষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। প্রতারণাকারী খাঁটি মুসলমান নয়। আমাদের নবি (স.) একদিন বাজারে গিয়ে খাদ্যদ্রব্যের একটি বড় স্তূপ দেখতে পান। স্তূপটির উপরিভাগের দ্রব্য শুকনো ছিল। কিন্তু স্তূপটির ভিতরের অংশও শুকনো আছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তখন তিনি ভিতরের অংশ ভিজা দেখতে পেলেন। রাসুলুল্লাহ (স.) মালিকের কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। মালিক জানাল তাতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। তখন রাসুল (স.) তাকে বললেন, তুমি ভেজা খাদ্য উপরে রাখলে না কেন? যাতে লোকেরা তা দেখতে পেত?

এ প্রসঙ্গে মহানবি বললেন,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : 'যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' (মুসলিম)

প্রতারণা মুনাফিকের কাজ। এর শাস্তি বড় কঠিন। সত্যিকার ইমানদার ব্যক্তি কখনোই প্রতারণার আশ্রয় নেয় না। মানুষকে ধোঁকা দেয় না। অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

আমরা প্রতারণা করব না। মানুষকে ধোঁকা দেবো না। অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে প্রতারণার কুফল আলোচনা করবে এবং এগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।
বাড়ির কাজ : তুমি বা তোমার পরিবারের কেউ প্রতারিত হয়ে থাকলে সে ঘটনা সংক্ষেপে লেখ।

পাঠ ১৩

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া (عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া বলতে বোঝায়, তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান না করা। পিতামাতার কথামতো না চলা, তাঁদের নির্দেশ অমান্য করা। আল্লাহর অনুগ্রহের পর সন্তানদের প্রতি পিতামাতার অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তাঁরা সন্তানের আপনজন। তাঁদের স্নেহ-মমতায় সন্তান লালিত-পালিত হয়। সন্তানের আরাম আয়েশের জন্য

তাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাঁরা সবরকম ব্যবস্থা করেন। কাজেই সন্তানের কর্তব্য হলো পিতামাতার বাধ্য থাকা।

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া জঘন্য অপরাধ। এর অপকারিতা অনেক।

অপকারিতা

১. শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।

২. পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার পাপ এত ভয়াবহ যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এ পাপ ক্ষমা করেন না। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, 'মহান আল্লাহ তার ইচ্ছা অনুযায়ী সকল পাপই ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতার পাপ তিনি ক্ষমা করেন না।' (বায়হাকি)

৩. পিতামাতার অবাধ্য হলে পরকালে জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে।

এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তাঁরাই (পিতামাতা) তোমার বেহেশত ও দোযখ।' (ইবনু মাজাহ)

অর্থাৎ পিতামাতার সন্তুষ্টির উপর যেমন সন্তানের জান্নাত লাভ নির্ভর করে, ঠিক তেমনি তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণে সন্তান দোযখবাসী হবে। নবি করিম (স.) আরও বলেন, 'তার নাক ধূলিমলীন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলীন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলীন হোক।' তাঁকে জিজ্ঞাস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! সে কে? তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি পিতামাতার যেকোনো একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, তবুও সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারল না।' (মুসলিম)

৪. মাতার অবাধ্য হওয়াকে আল্লাহ তায়ালা হারাম ঘোষণা করেছেন।
রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য মায়েদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।' (সহিহ্ বুখারি)

৫. পিতা সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তায়ালাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।
রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।' (তিরমিযি)

পিতামাতা সন্তানের কল্যাণেই কখনো তাঁদের শাসন করেন বা কড়া কথা বলেন। এটা সন্তানকে মেনে নিতে হবে। এতে তার ভবিষ্যৎ সুখময় হবে।

আমরা পিতামাতার আদেশ-নিষেধ মেনে চলব। এটি মানবিক দায়িত্ব। এতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে পিতামাতার অবাধ্যতার পরিণতি কী তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ১৪

ইভটিজিং (যৌন হয়রানি)

ইভটিজিং শব্দটি ইভ (Eve) ও টিজিং (Teasing)-এর একত্রিতরূপ। বাইবেল অনুসারে প্রথম নারীর নাম ইভ (Eve)। এখানে 'ইভ' বলতে নারী সমাজকে বোঝানো হয়েছে। আর 'Tease' অর্থ পরিহাস, জ্বালাতন করা, উত্ত্যক্ত করা, খেপানো। ইভটিজিং (যৌন হয়রানি) বলতে কথা, কাজ, আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে নারীদের উত্ত্যক্ত করাকে বোঝানো হয়েছে। নারীদের প্রতি অশালীন উক্তি করা, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা ইভটিজিংয়ের (যৌন হয়রানির) অন্তর্ভুক্ত।

১৯৭৬ সালে প্রণীত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স -এ ইভটিজিং -কে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যাতে বলা হয় যে, রাস্তা বা জনসম্মুখে কোনো নারীকে অশোভন শব্দ, অঙ্গভঙ্গি ও মন্তব্যের মাধ্যমে যৌন উৎপীড়ন করা ইভটিজিং হিসেবে গণ্য হবে।

অপকারিতা

ইভটিজিং (যৌন হয়রানি) একটি সামাজিক ব্যাধি। নারীদেরকে উত্ত্যক্ত করা, কাউকে মন্দনামে ডাকা বা উপহাস করা গর্হিত কাজ। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَلْمِزُوٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

অর্থ : "তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করবে না এবং একে অপরকে মন্দনামে ডাকবে না। ইমান গ্রহণের পর মন্দনামে ডাকা বড় ধরনের অপরাধ। যারা তওবা না করে তারাই যালিম।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১১)

বর্তমানে প্রায়ই স্কুল-কলেজের সামনে, রাস্তার মোড়ে, গলির মুখে কিছু বখাটে ছেলে দাঁড়িয়ে মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করে। এর ফলে অনেক মেয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। কেউ কেউ আবার আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। এতে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। জাতি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

প্রতিকার

১৯৭৬ সালে প্রণীত বাংলাদেশ আইনে ইভটিজিং (যৌন হয়রানি) একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এর শাস্তি হিসেবে সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। পারিবারিক অনুশাসন, ধর্মীয় শৃঙ্খলা, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমরা ইভটিজিংয়ের (যৌন হয়রানির) মতো খারাপ কাজ করব না। আমরা সবসময় ভদ্র, নম্র, শালীন আচরণ করব। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা ইভটিজিংয়ের (যৌন হয়রানির) ফলে কী কী সামাজিক ক্ষতি হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।
বাড়ির কাজ : সমাজে ইভটিজিং (যৌন হয়রানি) প্রতিরোধ করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ১৫

ছিনতাই (اَلْاِنْتِهَابُ)

জোরপূর্বক বা বল প্রয়োগ করে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়াকে ছিনতাই বলে। ছিনতাই একটি সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড। এতে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। নিরপত্তাহীনতায় থাকে।

কুফল

ছিনতাই একটি জঘন্য সামাজিক অনাচার। এটি চুরি-ডাকাতি অপেক্ষা মারাত্মক। ছিনতাই সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। মানুষের মূল্যবান অর্থ সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

ছিনতাইকারী দুনিয়াতে ও আখিরাতে নির্মম শাস্তি ভোগ করবে। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِّنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهٗ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

অর্থ : 'যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ জমি ছিনতাই করে, কিয়ামতের দিন সাতগুণ জমি তার গলায় বেড়িরূপে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

যে ছিনতাই করে তার পূর্ণ ইমান থাকে না। এ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, 'কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছিনতাই ও লুটতরাজ করলে সে মুমিন থাকে না'

ছিনতাই বর্বর যুগের চরিত্রবিশেষ। ইসলাম এ বর্বরতাকে সমূলে উৎপাটন করার লক্ষ্যে ঘোষণা করেছে,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِى الْاِسْلَامِ

অর্থ : 'ইসলামি বিধানে না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিয়ম আছে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নিয়ম আছে।'

পবিত্র কুরআন মজিদে এবং মহানবি (স.)-এর হাদিসে ছিনতাই, ডাকাতি, লুটতরাজ ইত্যাদি অপকর্মের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রতিকার

এ ধরনের সামাজিক অপরাধ, অনাচার, অত্যাচার থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন।

মানুষকে ছিনতাই -এর কুফল সম্পর্কে সচেতন করা এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে এর অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন।

অপরাধীদেরকে এরূপ সামাজিক অনাচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে আইনের হাতে সোপর্দ করতে হবে।

সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এ ধরনের অনাচার সমাজ থেকে দূর হবে।

আমরা ছিনতাইয়ের কুফল অনুধাবন করব। এ ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হবো না। এ জঘন্য কাজ যারা করে তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে ছিনতাইয়ের কুফল আলোচনা করে এর প্রতিকারের উপায়গুলো পোস্টার লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন যুদ্ধে বিজয়ের পর ইহুদি মহিলা মহানবি (স.)-কে বিষ মিশ্রিত গোশত খেতে দেয়?

ক. বদর   খ. উহুদ

গ. খাইবার   ঘ. হুনাইন

২. 'নামায শেষে তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড়।' আল্লাহ তায়ালার এ নির্দেশের উদ্দেশ্য কী?

ক. শ্রমিকের অধিকার বর্ণনা করা   খ. নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করা

গ. শ্রমের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা   ঘ. শ্রমের গুরুত্ব বর্ণনা করা

৩. শালীনতার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ তা মানুষকে –

i. আল্লাহর অনুগত বান্দা হতে সাহায্য করে

ii. পরিবেশের প্রতি সদাচরণে সহায়তা করে

iii. অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাবির আবিরের নিকট একটি বই জমা রাখল। দুই দিন পর ফেরত চাইলে আবির বইটি ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়।

৪. আবিরের দ্বারা কী লঙ্ঘিত হয়েছে?

ক. আহদ খ. আমানত

গ. আদল ঘ. তাহসিব

৫. আবিরকে বলা যায় –

ক. মুশরিক খ. মুনাফিক

গ. ফাসিক ঘ. কাফির

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শিল্পপতি জামিল সাহেব তাঁর গার্মেন্টিসে কর্মীদের যথাসময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পরিশোধ করেন। তিনি কর্মীদেরকে সততার সাথে কাজ করার পাশাপাশি তৈরি পোষাকের গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য কঠোর নির্দেশ দেন। তারপরও এক কর্মী জনাব মাযহার আলী ইচ্ছাকৃতভাবে কাপড় কম দিয়ে পোশাক তৈরি করে এবং বিষয়টি গোপন রাখে। এতে জামিল সাহেবের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে জামিল সাহেব ঐ কর্মীর বেতন বন্ধ করে দেন। এক পর্যায়ে সামান্য বেতনের ঐ কর্মচারীর পরিবারের সমস্যার কথা বুঝতে পারলে জামিল সাহেব ঐ কর্মচারীকে ক্ষমা করে বেতন চালু করে দেন।

(ক) শালীনতা কী?

(খ) যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়- হাদিসটি ব্যাখ্যা কর।

(গ) জামিল সাহেবের আচরণে যে গুণটি সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) জনাব মাযহার আলীর কর্মকাণ্ডটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২। জসিম সাহেবের বাড়িতে রজব মিয়া মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে কাজ করে। বেতনের টাকাগুলো জসিম সাহেবের নিকটই জমা রাখেন। এভাবে দুই বছর কাজ করার পর ঢাকা শহরে বেড়াতে এসে নিখোঁজ হন। এ অবস্থায় জমানো টাকা দিয়ে জসিম সাহেব তার এলাকায় এক বিঘা জমি ক্রয় করে রজব মিয়ার নামে কওলা করেন। দীর্ঘ দশ বছর পরে রজব মিয়া জসিম সাহেবের বাড়িতে ফিরে আসলে, জসিম সাহেব তার জমির দলিল হাতে দিয়ে জমি বুঝিয়ে দেন। অপরদিকে আরমান সাহেবের ড্রাইভার রমিজ মিয়া বিদেশে যাওয়ার জন্য জমি বিক্রি করে আরমান সাহেবের নিকট দুই লাখ টাকা দেন। আরমান সাহেব তাকে বিদেশে পাঠানোর কথা বলে একটি জাল ভিসা তৈরি করে দেন। রমিজ মিয়া এর মাধ্যমে বিদেশে যেতে ব্যর্থ হয়ে টাকা ফেরত চাইলে আরমান সাহেব বলেন, তোমাকে ভিসা দেওয়া হয়েছে, কাজেই তুমি বিদেশে যেতে না পারার দায়ভার আমি বহন করব না।

(ক) পরোপকার কী?

(খ) আখলাকে যামিমাহ্ বলতে কী বোঝায়?

(গ) জসিম সাহেবের কাজটির মাধ্যমে কোন বিষয়টি রক্ষা পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) রমিজ মিয়ার সাথে আরমান সাহেবের আচরণের পরিণতি কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করলেই মানুষ সেরা হতে পারে। যে জীবন অনুসরণ ও অনুকরণ করলে মানুষের জীবন সুন্দর ও সফল হয়, তাকে আদর্শ জীবন বলে। আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে যেসব নবি ও রাসুল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ। এমনিভাবে যেসব মনীষী, নবি ও রাসুলগণের পথ অনুসরণ করেছেন তাঁরাও আদর্শ মানুষ। তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলো আমাদের আদর্শ।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- আদর্শ জীবনচরিত অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত মুহাম্মদ (স.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলি (রা.), ও হযরত ফাতিমা (রা.)–এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে পারব।
- মনীষীগণের গুণাবলি যেমন– সমাজসেবা, সাম্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সৌহার্দ, মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ, ক্ষমা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যায়বিচার, দানশীলতা, পরোপকারিতা, দেশপ্রেম, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে তাঁদের অবদান ও শিক্ষা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে মনীষীগণের গুণাবলি অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠনের উপায় বলতে পারব।
- দলগত কাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার উপায় এবং সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ ১

হযরত ইসমাঈল (আ.)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবি। তিনি হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর মাতার নাম হাজিরা (আ.)। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। তিনি কুরাইশ ও উত্তর আরবের 'আদনান' বংশের আদি পিতা।

মক্কায় স্থানান্তর ও জমজম কূপ সৃষ্টি

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্মের কিছুদিন পর তাঁর পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে ও তাঁর মাতাকে নির্জন ভূমিতে রেখে আসেন। তিনি তাঁদেরকে কিছু খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে আসেন এবং তাঁদের জন্য এ বলে দোয়া করেন- "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট। 'হে আমার প্রতিপালক! এজন্য যে তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর তাঁদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাঁদের রিযিকের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" (সূরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৭)

অল্প কিছুদিন পর তাঁদের খাবার ফুরিয়ে যায়। শিশু ইসমাঈল পানির পিপাসায় কাতর হয়ে ওঠেন। তার চিৎকারে মা হাজিরা (আ.) অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাতবার ছোটাছুটি করেন। কিন্তু কোথাও পানি পেলেন না। অবশেষে ফিরে এসে দেখতে পান শিশু ইসমাঈলের পদাঘাতে আল্লাহর হুকুমে সে স্থানে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে আর এটাই হলো জমজম কূপের উৎস। হযরত হাজিরা (আ.) ঐ কূপ থেকে নিজে পানি পান করেন এবং তাঁর শিশু পুত্রকেও তা পান করান। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এ কূপকে কেন্দ্র করে জুরহুম গোত্র সেখানে বসবাস শুরু করে। এ গোত্রে হযরত ইসমাঈল (আ.) বিবাহ করেন। কুরাইশ গোত্র এ গোত্রের একটি শাখা।

কুরবানি

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ ছিল একটি পরীক্ষা। একদা হযরত ইবরাহিম (আ.) সিরিয়া থেকে বিবি হাজিরা ও পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে দেখতে মক্কায় গমন করেন। তখন হযরত ইবরাহিম (আ.) স্বপ্নযোগে পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করতে আদিষ্ট হন। তখন ইসমাঈলের বয়স ছিল ১৩ বছর। জাগ্রত হয়ে হযরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে বলেন, 'হে পুত্র! স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমাকে কুরবানি করছি। তুমি কী বলো?' তখন পুত্র ইসমাঈল কোনোরূপ বিচলিত না হয়ে আনন্দ চিত্তে উত্তরে বলেন, "হে পিতা! আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে আপনি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন।"
(সূরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০২)

হযরত ইবরাহিম (আ.) পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার উদ্দেশ্যে 'মিনা'র পথে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে শয়তান ইসমাঈল (আ)-কে বারবার প্রতারিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে নির্বিঘ্নে মিনায় পৌছেন। হযরত ইবরাহিম (আ.) প্রাণ-প্রিয় পুত্রকে কুরবানি করার জন্য উদ্যত হলেন। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহিম (আ.) আওয়াজ শুনতে পেলেন, "হে ইবরাহিম! তুমিতো তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।" (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০৫)। অলৌকিকভাবে পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর স্থলে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল আর ইসমাঈল (আ.) দুম্বার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এ ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের এ পশু কুরবানি। কুরবানি করা ওয়াজিব।

কাবাগৃহ নির্মাণ

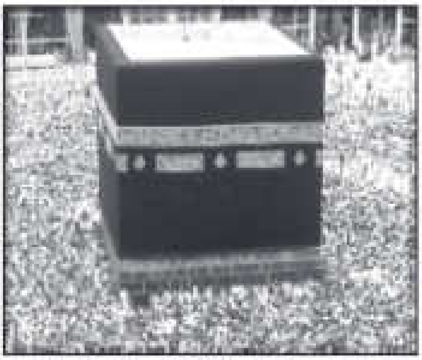

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পিতা হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর হুকুমে তারই প্রদর্শিত স্থানে প্রথম কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- "স্মরণ কর! যখন ইবরাহিম ও ইসমাঈল কাবাঘরের প্রাচীর তুলে ছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১২৭)। হযরত ইবরাহিম (আ.) পাথরের গাঁথুনি লাগাতেন আর ইসমাঈল (আ.) তাঁকে পাথর তুলে দিতেন। দীর্ঘ সময় ধরে পিতা-পুত্র কাবাঘর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন।

উপাধি লাভ

হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন ধৈর্যশীল ও পিতাভক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে 'ছাদেকুল ওয়াদ' (অঙ্গীকার পালনকারী) উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকার করেছেন: অমুক স্থানে তার জন্য অপেক্ষা করবেন, লোকটি কথা অনুযায়ী সে স্থানে না আসলেও তিনি তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন এবং তৃতীয় দিন তার সাথে সেখানে দেখা হয়। (ইবনু কাছির)

নিজের ওয়াদা রক্ষার জন্য তিন দিন পর্যন্ত কষ্ট করে অপেক্ষা করেছিলেন বলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহ ছাদেকুল ওয়াদ বা অঙ্গীকার পালনকারী উপাধি দান করেছিলেন।

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশেই জন্মগ্রহণ করেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। হযরত ইসমাঈল (আ.) একশত ছত্রিশ বছর বয়সে মক্কা নগরীতে ইন্তিকাল করেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) কর্তৃক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, পিতৃভক্তি, ত্যাগ, অঙ্গীকার পালন ইত্যাদি আমাদের জীবনের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানির কাহিনী ও জমজমের উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করবে।

পাঠ ২
হযরত ইউসুফ (আ.)

পরিচয়

হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবি। তাঁর পিতার নাম হযরত ইয়াকুব (আ.) আর মাতার নাম রাহিলা বিনতে লাবন। তিনি হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর একাদশতম পুত্র। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১৯২৭-১৮১৭ -এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কেনানের অধিবাসী। শারীরিক গঠনে অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী। আর ব্যবহারে বিনয়ী ও উত্তম চরিত্র গুণে গুণান্বিত। পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীকে 'আহসানুল কাসাস' (সর্বোত্তম কাহিনী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ষড়যন্ত্রের কবলে হযরত ইউসুফ (আ.)

হযরত ইয়াকুব (আ.) স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-কে অনেক আদর করতেন। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর বিন ইয়ামিন ব্যতীত অন্যান্য বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। তারা তাঁর ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর অনুমতি নিয়ে একদিন তারা তাঁকে খেলার কথা বলে নির্জন একটি মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে তারা তাঁকে মারধর করে একটি গভীর কূপে নিক্ষেপ করে। বাড়িতে ফিরে এসে তাঁরা পিতাকে বলে, আমরা যখন খেলাধুলা করছিলাম তখন একটি বাঘ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং খেয়ে ফেলে। দেখুন এই যে তাঁর রক্তমাখা জামাকাপড়। কিন্তু হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁদের কথায় বিশ্বাস করলেন না, বরং মর্মাহত হলেন। তিনি ক্রোধ প্রকাশ না করে ধৈর্যধারণ করে বললেন, "ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ আমার সাহায্যস্থল।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ১৮)

ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয়

একটি বণিকদল ঐ কূপের পাশ দিয়ে মিসরে যাচ্ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় দলটি কূপের ধারে এসে থামল। তাঁরা পানির জন্য কূপের ভিতরে বালতি ফেললে হযরত ইউসুফ (আ.) বালতির রশি ধরে উপরে উঠে আসেন। তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, "কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! অতঃপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ১৯)

তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরে দাস হিসেবে বিক্রি করে। মিসরের শাসক আজিজ তাঁকে স্বল্প মূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের (মুদ্রা) বিনিময়ে ক্রয় করেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুত্রের মতো ভালোবাসতে থাকেন। হযরত ইউসুফ(আ.) যুবক বয়সে মিথ্যা অপবাদের দায়ে কারাবরণ করেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার দরুণ ক্রমান্বয়ে কারাগারে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

একদিন মিসরের বাদশাহ স্বপ্ন দেখেন, 'সাতটি সুস্থ-সবল গাভিকে সাতটি দুর্বল গাভি খেয়ে ফেলছে। তিনি আরও দেখেন সাতটি সবুজ শস্য শিষ এবং সাতটি শুষ্ক শিষ।' তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য রাজদরবারে জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতদের ডাকেন। কিন্তু কারোর ব্যাখ্যা তাঁর পছন্দ হয়নি। বাদশাহ খবর পেলেন কারাগারে এক যুবক আছেন, যিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে পারেন। অবশেষে বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট এ স্বপ্নের

ব্যাখ্যা জানতে চান। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় হযরত ইউসুফ (আ.) বলেন, 'দেশে সাত বছর প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে। আর পরবর্তী সাত বছর একটানা ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলবে।' সাথে সাথে তিনি দুর্ভিক্ষ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়ও বলে দিলেন।এ ব্যাখ্যা বাদশাহের অত্যন্ত মনঃপূত হলো। ফলে তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ তুলে নেন এবং তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন।

মন্ত্রী পদ লাভ

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় খুশি হয়ে বাদশাহ তাঁকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর প্রচুর খাদ্যশস্য ফলন হয়। পরবর্তী সাত বছরে কম ফলন হওয়ায় মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অভাবের তাড়নায় তাঁর ভ্রাতারা তিনবার খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য রাজদরবারে আসে। প্রথমবারেই হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁদের চিনে ফেলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের নিকট নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। তবে মানবিক কারণে প্রত্যেকবারই তাঁদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেন। দ্বিতীয়বার কৌশলে আপন সহোদর বিন ইয়ামিনকে আটকিয়ে রাখেন। তৃতীয়বার নিজের পরিচয় প্রদান করেন এবং পিতার-পরিবারের লোকজনকে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। তখন ভ্রাতাগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে : "তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরাতো অপরাধী ছিলাম।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯১)

হযরত ইউসুফ (আ.) এ বলে তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন যে, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯২)

পরবর্তী সময়ে ভাইয়েরা তাঁদের বৃদ্ধ পিতাকে সাথে নিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাঁদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। এরপর তাঁরা সকলে একসাথে মিলেমিশে বসবাস করতে থাকেন। হযরত ইউসুফ (আ.) ১১০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা হযরত ইউসুফ(আ.)-এর মতো বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করব। তার মতো চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করব এবং ক্ষমা করতে শিখব।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করবে।

পাঠ ৩

হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর জীবনাদর্শ

হযরত মুহাম্মদ (স.) নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কা নগরীতে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। মক্কার পরিবেশ দাওয়াতের অনুকূল না থাকায় তিনি আল্লাহর নির্দেশে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন।

হিজরত ও দেশপ্রেম

হিজরত অর্থ ত্যাগ করা, ছিন্ন করা। ইসলামি পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ বা ধর্মের নিরাপত্তার জন্য বাসভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করা। সত্য ও ন্যায়ের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো দেশে গমন করাই হিজরত। হিজরতের আর একটি অর্থ রয়েছে শরিয়তের নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা। মক্কা নগরীতে ইসলামের কাজ যখন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকল, তখন হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যা করার জন্য মক্কার কাফিররা সিদ্ধান্ত নিল। সে অনুযায়ী তারা এক রাতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ঘর অবরোধ করল। আল্লাহ তায়ালা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে কাফিরদের এ সিদ্ধান্তের ও অবরোধের কথা জানিয়ে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর কাছে রাখা আমানতের সম্পদগুলো হযরত আলি (রা.)-কে বুঝিয়ে দিলেন এবং স্বীয় বিছানায় তাঁকে রেখে হযরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে করে প্রত্যুষে কাফিরদের চোখ এড়িয়ে মদিনার দিকে রওয়ানা হলেন। কাফিররা ঘরে প্রবেশ করে মহানবি (স.)-এর বিছানায় হযরত আলি (রা.)-কে দেখে ভীষণ রাগান্বিত হলো। তবে তারা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আমানতদারী দেখে লজ্জিত হলো। যাকে শত্রু ভেবে হত্যার জন্য তাদের এ প্রচেষ্টা, তিনি এত মহান ও উদার হতে পারেন তা তারা চিন্তাও করেনি। মহানবি (স.) আবু বকর (রা.)-কে নিয়ে সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এদিকে কাফিররাও তাঁদের খুঁজতে গুহার মুখ পর্যন্ত এসে পড়ল। আবু বকর (রা.) এ অবস্থা দেখে খুব বিচলিত হলেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁকে বললেন, "তুমি চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" (সুরা-আত তাওবা, আয়াত ৪০) পরিশেষে হযরত মুহাম্মদ (স.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌঁছলেন। মদিনার সর্বস্তরের লোক তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল।

মক্কায় কাফিররা যতই নির্যাতন করল, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদের সব নির্যাতন সহ্য করলেন। তিনি তাঁর সাথীদের বিভিন্ন দেশে হিজরত করালেও প্রিয় জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে নিজে কোথাও যাননি। অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের আদেশ আসল। হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে মদিনায় চলে গেলেন। তিনি জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার সময় মক্কাকে লক্ষ্য করে বললেন 'আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর সর্বোত্তম ভূখণ্ড এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভূমি। আমাকে এখান থেকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া না হলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।' (তিরমিযি)

মদিনা সনদ

হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে মদিনার সনদ উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রীয় বিভেদ নিরসন করে পারস্পরিক শান্তি-সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে কতিপয় নীতিমালা তৈরি করেন। যা মদিনা সনদ নামে খ্যাত। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান।

মদিনা সনদের ধারাসমূহ

সনদে মোট ৪৭টি (মতান্তরে ৫০টি) ধারা ছিল। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধারা উল্লেখ করা হলো-

১. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহকে নিয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠিত হবে।

২. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহের কারো উপর যদি বাইরের শত্রু আক্রমণ করে তবে সকল সম্প্রদায় মিলে শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে।

৩. কেউ মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কুরাইশদের কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না কিংবা তাদের সাথে কোনোরূপ গোপন চুক্তিও করতে পারবে না।

৪. সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্ম পালনে বাধা সৃষ্টি করবে না।

৫. কেউ যদি কোনোরূপ অপরাধ করে, তবে তার জন্য তাকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে। এজন্য তার সম্প্রদায়কে দোষারোপ করা যাবে না।

৬. অসহায়, দুর্বল, অত্যাচারিতকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।

৭. হত্যা, রক্তারক্তি ইত্যাদি কাজকর্ম এখন থেকে নিষিদ্ধ করা হলো।

৮. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হবেন এবং তিনিই পদাধিকার বলে প্রধান বিচারপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

মদিনা সনদের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সনদের ফলে মদিনার লোকজনের মাঝে সকল হিংসা-বিদ্বেষ ও কলহের অবসান হলো। তারা ঐক্যবদ্ধ হলো। ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো। মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে এক উদার সম্প্রীতি স্থাপিত হলো।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ক্ষমতাবৃদ্ধি, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়সহ ইসলাম প্রসারের কাজ আরও বেগবান হলো। নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গড়ে উঠল রাজনৈতিক ঐক্য এবং গোড়াপত্তন হলো একটি শান্তিময় ইসলামি রাষ্ট্রের।

মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সুশাসন

মদিনা সনদের ফলে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হলো। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হলো একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্র। ফলে মুসলমানগণ বিনা বাধায় সকল ইসলামি বিধি-বিধান পালন করার সুযোগ পেল। হযরত মুহাম্মদ (স.) মদিনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর সুশাসনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হলো-

ক. আইনের কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করা।

খ. ধর্ম, বর্ণ গোত্রভেদে সকল নাগরিকের প্রতি সুবিচার করা।

গ. মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ. সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ঙ. মজলিসে শূরা বা পরামর্শ পরিষদ গঠন করা।

চ. ভালো কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করা ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত মুহাম্মদ (স.)–এর দূরদর্শিতা

জন্মভূমিকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার অদম্য ইচ্ছা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মনে জাগ্রত হলো। অবশেষে ৬ষ্ঠ হিজরি মোতাবেক ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের যিলকদ মাসে তিনি মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে ছিল ১৪০০ (চৌদ্দশত) নিরস্ত্র সাহাবি। তাঁদের কোনো সামরিক উদ্দেশ্য ছিল না। প্রত্যেকের সাথে ছিল মাত্র একটি করে কোষবদ্ধ তরবারি। তৎকালীন আরবে প্রত্যেক লোকের সাথেই এসব থাকত। হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর সাথীদের নিয়ে মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। মক্কার কাফিররা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ শুনে খুব ভীতসন্ত্রস্ত হলো। তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য সদল বলে অস্ত্রসহ অগ্রসর হলো। হযরত মুহাম্মদ (স.) মুসলমানদের পক্ষ হতে তাঁদের নিকট হযরত উসমানকে দূত হিসেবে পাঠালেন। কাফিরদেরকে বোঝানো হলো যে মুসলমানরা শুধু হজ করে আবার চলে যাবে। হযরত উসমান (রা.) আসতে দেরি হওয়ায় মুসলমানদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স.) সাহাবিদের নিয়ে একটি গাছের নিচে সমবেত হলেন এবং উসমান হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য শপথ নিলেন। এ শপথ 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে পরিচিত। মুসলমানদের কঠিন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে কাফিররা হযরত উসমানকে মুক্তি দিল। অনেক বাকবিতণ্ডার পর মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে চুক্তি হলো। এ চুক্তি 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। এ চুক্তির লেখক ছিলেন হযরত আলি (রা.)। চুক্তিতে অনেকগুলো শর্ত ছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো-

১. ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানগণ হজ সমাপন না করেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে।

২. কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে আগামী দশ বছর যেকোনো প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে।

৩. আগামী বছর মুসলমানগণ হজ করতে পারবে। কিন্তু তিন দিনের অধিক সময় মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না। সেই তিন দিন কুরাইশগণ নগর পরিত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করবে।

৪. হজে আগমনকালে মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্য কেবল কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না।

৫. হজের সময় মুসলমানদের জানমাল নিরাপদ থাকবে।

৬. মক্কার বণিকগণ মদিনার পথ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদে সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসায়–বাণিজ্য করতে পারবে।

৭. সন্ধির শর্তাবলি উভয় পক্ষকে পুরোপুরিভাবে পালন করতে হবে।

সন্ধির চুক্তিগুলো বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের বিপক্ষে মনে হলো। তবে বাস্তবে সব শর্তই মুসলমানদের অনুকূলে ছিল। সন্ধির ফলে পরবর্তীতে বিনা বাধায় মক্কা বিজয়সহ মুসলমানদের অনেক অগ্রগতি হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে উঠল।

বর্তমান মুসলিম জাতির উচিত মদিনা সনদ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি হতে শিক্ষা গ্রহণ করা। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে।

দলগত কাজ :	শিক্ষার্থীরা দলে বসে আলোচনা করে মদিনা সনদের আটটি ধারার একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টারে লিখবে।
বাড়ির কাজ :	শিক্ষার্থীরা হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টারে লিখবে।

পাঠ ৪

হযরত উসমান (রা.)

পরিচয়

হযরত উসমান (রা.) ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফফান, মাতার নাম ছিল ওরওয়াহ। ইসলামের চার খলিফার মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় খলিফা। বাল্যকাল থেকেই তিনি নম্র, ভদ্র, লজ্জাশীল ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে রাসুল (স.) তাঁর প্রথম কন্যা রুকাইয়াকে তাঁর নিকট বিবাহ দেন। রুকাইয়া মারা গেলে অতঃপর উম্মে কুলসুমকে তাঁর কাছে বিবাহ দেন। ফলে তাঁকে 'যুন্নুরাইন' (দুই নুরের অধিকারী) বলা হতো। তিনি ব্যবসা করতেন বিধায় তাঁর অনেক সম্পদ ছিল। তাই তাঁকে 'গণি' (ধনী) বলা হতো। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে তাঁর চাচা হাকাম তাঁকে অনেক নির্যাতন করে। তাঁর নিকটাত্মীয়রাও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে তিনি তাঁর স্ত্রী রুকাইয়াসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

ইসলামের সেবা

হযরত উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর সর্বদা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সর্বদা রাসুল (স.)-এর সাথে থাকতেন। এ কাজে তিনি তার সম্পদ উদার হস্তে ব্যয় করেন। তিনি নিজ খরচে মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করেন। মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি দশ হাজার দিনার (মুদ্রা) ও এক হাজার উষ্ট্র মুসলিম সেনাবাহিনীকে দান করেন।

খিলাফত লাভ ও কুরআন সংকলন

হযরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা নির্বাচিত হলেন। অতঃপর তিনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনের পাশাপাশি পবিত্র কুরআন সংকলনে হাত দেন। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলে বিভিন্ন এলাকার লোকজন পবিত্র কুরআন বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করতে লাগল। ফলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিল। তিনি এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। রাষ্ট্রীয় নির্দেশ জারি করে তখনকার সময়ে বিদ্যমান পবিত্র কুরআনের সকল কপি সংগ্রহ করলেন। হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপিটি সংগ্রহ করার মাধ্যমে কুরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর মুসলিম জাহানের গভর্নরদের নিকট একটি করে কপি পাঠান। অবশিষ্ট সংগৃহীত কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। পবিত্র কুরআনকে মূল ভাষা অনুযায়ী সংকলন করার ফলে তাঁকে 'জামেউল কুরআন' (কুরআন সংকলক) বলা হয়। হযরত উসমান (রা.) দীর্ঘ ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৮৩ বছর বয়সে কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে শাহাদতবরণ করেন। তাঁর ব্যাপারে রাসুল (স.) বলেছেন- 'প্রত্যেক নবিরই একজন বন্ধু রয়েছে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবেন উসমান।'

হযরত উসমানের রাষ্ট্র পরিচালনা

হযরত উসমান (রা.) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর আমলে ইসলামী খিলাফত ব্যাপক বিস্তৃত হয়। পশ্চিমে মরক্কো, পূর্বে বর্তমান পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব এবং উত্তরে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান পর্যন্ত তা বিস্তার লাভ করে। তাঁর সময়ে সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রশাসনিক বিভাগসমূহ সম্প্রসারিত হয় এবং কল্যাণমূলক বহু কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

তিনি অনেকগুলো অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পাদন করেন, যাতে করে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত হয়। তিনি হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক প্রবর্তিত ভাতা প্রায় ২৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। তাঁর সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, বাজার পরিদর্শক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন, কৃষি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসক নিয়োগ করেন।

খলিফা হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে তিনি নিজের জন্য কোনো বেতন-ভাতা গ্রহণ করতেন না। তাঁর প্রথম ৬ বছরের শাসন আমল শান্তিপূর্ণ ছিল এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের মধ্যে তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন।

দলগত কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে হযরত উসমান সম্পর্কে লেখাটি পাঠ করে শ্রেণিতে দলগতভাবে আলোচনা করবে।
বাড়ির কাজ : ইসলামের কল্যাণে হযরত উসমান (রা.)-এর অবদানসমূহ উল্লেখ কর।

পাঠ ৫

হযরত আলি (রা.)

পরিচয়

হযরত আলি (রা.) ছিলেন রাসুল (স.)-এর চাচাতো ভাই। তিনি ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবু তালিব, মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। তিনি ছোটদের মধ্যে প্রথম মুসলমান। তিনি ১০ বছর বয়সে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি 'আশারা-ই-মুবাশ্‌শারার' (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবি)-এর একজন এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা। ছোটকাল থেকেই জ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তাই তিনি সর্বদা রাসুল (স.)-এর সাথে সাথে থাকতেন। রাসুল (স.)-এর প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল অসীম। রাসুল (স.) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর অতি আদরের কন্যা ফাতিমাকে হযরত আলি (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেন। হযরত আলি (রা.) খুব নির্ভিক ও সাহসী ছিলেন। রাসুল (স.) হিজরতের সময় তাঁকে তাঁর বিছানায় রেখে যান। রাসুল (স.)-এর কাছে আমানত রাখা সম্পদ মূল মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। এতে তাঁর জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এরপরও তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

বীরত্ব ও জ্ঞানসাধনা

হযরত আলি (রা.) ছিলেন একজন অসাধারণ বীরযোদ্ধা। তাঁর বীরত্বের কারণে বদরের যুদ্ধে 'জুলফিকার' নামক তরবারি উপহার পান। আর খায়বার যুদ্ধে 'কামুস' দুর্গ বিজয়ের পর রাসুল (স.) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) উপাধি দেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক ছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহনকারী ছিলেন।

জ্ঞান সাধক হযরত আলি (রা.) ছিলেন জ্ঞানপিপাসুদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁর জ্ঞানচর্চা অব্যাহত ছিল। কুরআনের তাফসির, হাদিসের বিশ্লেষণ এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। আরবি ভাষার ব্যাকরণ রচনায় তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল। তাঁর জ্ঞানের ব্যাপারে মহানবি (স.) বলেছেন, "আমি জ্ঞানের শহর, আর আলি (রা.) তার দরজা।" (মুসতাদরাক হাকিম)। হযরত আলি (রা.)-এর রচিত 'দেওয়ানে আলি' (আলির কাব্য সংকলন) আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তিনি তাঁর শাসনামলে মসজিদে জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা করেন।

খলিফা নির্বাচন

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত উসমান (রা.) শাহাদতবরণ করেন। এরপর মুসলমানদের মতামতের ভিত্তিতে হযরত আলি (রা.) মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি অনেক সমস্যার মুখোমুখি হন। অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে এগুলো সমাধা করেন।

হযরত আলি (রা.)-এর রাষ্ট্র পরিচালনা

তখন মুসলমানগণ চরম উপদলীয় কোন্দলে লিপ্ত হওয়ায় ইসলামের ইতিহাসের চরম সংকটকাল চলছিল। তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি রাজনৈতিক জোট (Coalition) গঠন করেন এবং প্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি (Nepotism) সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেন। তিনি অভিজাত ভূমি মালিকদের নিকট থেকে ভূমি পুনরুদ্ধার করেন এবং আদায়কৃত কর ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলিম নাগরিকগণের মধ্যে সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যেহেতু তখন প্রায় সকল মুসলমানই বেদুঈন ও কৃষক ছিলেন সে কারণে তিনি ভূমি ও কৃষি উন্নয়নের বিষয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন।

হযরত আলি (রা.)-এর প্রশাসনিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে মিসরের গভর্নর মালিক আল-আশতারের কাছে প্রেরিত নির্দেশনামূলক একটি চিঠিতে, তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তুমি তোমার প্রজাদের জন্য তোমার অন্তকরণে ক্ষমা, ভালবাসা ও দয়া প্রবিষ্ট কর। তাদেরকে সহজে শিকারযোগ্য মনে করে তাদের সম্মুখে পেটুক জন্তুর মতো হয়ো না। কেননা তারা দুইধরনের : হয়তো তারা তোমার ধর্মীয় ভাই নয়তো তারা সৃষ্টিগতভাবে তোমার সমান। তারা অসতর্কভাবে ভুল করতে পারে, তাদের অদক্ষতা থাকতে পারে, তাদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলবশত (মন্দকাজ) সংঘটিত হতে পারে। সুতরাং তাদেরকে সেভাবেই ক্ষমা কর যেভাবে তুমি আল্লাহর কাছে তার ক্ষমা প্রত্যাশা কর। কেননা, তুমি তাদের উপরে এবং যে তোমাকে নিযুক্ত করেছে সে তোমার উপরে, আর আল্লাহ তার উপরে যে তোমাকে নিযুক্ত করেছে।

তুমি তাদের (প্রজাদের) চাহিদাগুলো পূরণ করবে আল্লাহ তাই প্রত্যাশা করেন এবং তিনি তাদের দ্বারা তোমাকে পরীক্ষা করছেন।"

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত নির্দেশনাকে ইতিহাসে ইসলামি শাসনের আদর্শ সংবিধান (Ideal Constitution of Islamic Governance) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

জীবনযাপন

হযরত আলি (রা.) ছিলেন সহজ-সরল ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ। ছোটকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। নিজের খাদ্য নিজেই যোগাড় করতেন। কখনো কখনো অনাহারে থাকতেন। তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন। জীর্ণ কুঠিতে বসবাস করতেন। ধনী-দরিদ্র সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরও এসব গুণাবলি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তিনি প্রায় ৬ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে মুলজাম নামক এক পথভ্রষ্ট খারেজির হাতে শাহাদতবরণ করেন। তখন তিনি নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। রাসুল (স.) তাঁর ব্যাপারে বলেছেন- 'সে [আলি (রা.)] প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু।' (তিরমিযি)

> **বাড়ির কাজ :** শিক্ষার্থীরা জ্ঞানসাধনায় হযরত আলি (রা.)-এর অবদান সম্পর্কে ১০টি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে।

পাঠ ৬

হযরত ফাতিমা (রা.)

পরিচয়

হযরত ফাতিমা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কনিষ্ঠ কন্যা। তাঁর মাতা ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)। তিনি নবুয়তের ৫ বছর পূর্বে ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্না ও সৎ চরিত্রের অধিকারিণী।

তিনি যাহরা (অনিন্দ্য সুন্দরী, পরমা লাবন্যময়ী) ও বাতুল (পবিত্র, সংসারে অনাসক্ত) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর হিজরি দ্বিতীয় সনে হযরত আলি ইবনু আবু তালিবের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের দেন মোহর ছিল ৪৮০ - ৫০০ দিরহাম (মুদ্রা)।

সরল জীবনযাপন

হযরত ফাতিমা (রা.) খুব সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। তাঁর স্বামী হযরত আলি (রা.) দরিদ্র হলেও তাঁর কোনো দুঃখ ছিল না। হযরত আলি (রা.) পরিশ্রম করে যা অর্জন করতেন তা দিয়ে তিনি সংসার চালাতেন। কখনো কখনো অনাহারে-অর্ধাহারে তাঁর দিন অতিবাহিত হতো। তিনি ত্যাগ স্বীকার করতেন কিন্তু কখনো ধৈর্য হারাতেন না। এমনকি তাঁর চেহারায়ও কষ্টের কোনো ছাপ দেখা যেত না। তিনি নিজ হাতে সংসারের সকল কাজ করতেন। তাঁর কোনো চাকরানী ছিল না। জাঁতা পিষা ও বালতি দিয়ে পানি উঠানোর ফলে তার হাতে ফোস্‌কা পড়ে যেত। তিনি সবসময় সাজসজ্জা ও জাঁকজমক পোশাক পরিহার করে চলতেন।

দানশীলতা

হযরত ফাতিমা (রা.) দানের ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদার। দান করার সময় তিনি যে অভাবী তা বোঝা যেত না। খালি হাতে কেউ তাঁর নিকট থেকে ফেরত যেত না। বর্ণিত আছে, একদা তিনি খাবারের লোকমা মুখে তুলছিলেন, এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে বলল, 'হে নবি কন্যা! আমাকে ভিক্ষা দিন। গত তিন দিন যাবৎ আমি অনাহারে আছি।' তিনি তাঁর খাবারটুকু ভিক্ষুককে দিতে পুত্র হাসানকে নির্দেশ দিলেন। এতে হাসান (রা.) আপত্তি জানিয়ে বললেন, আম্মা! গতকাল হতে আপনি কিছুই খাননি। আপনি এ খাবার খেয়ে নিন। উত্তরে তিনি পুত্র হাসানকে বললেন, 'এটা ভুল হবে। আমি মাত্র একদিন অভুক্ত আছি, আর এ ফকির তিন দিন ধরে কোনো কিছু খায়নি।'

পিতৃভক্তি

ছোটবেলা হতে হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁর পিতার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পূর্বে তিনি হযরত ফাতিমা (রা.)-কে ডাকলেন, কানে কানে কী যেন বললেন, সাথে সাথে হযরত ফাতিমা (রা.) কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পুনরায় মহানবি (স.) তাঁকে কাছে ডেকে কী যেন বললেন, তাতে তিনি হাসতে লাগলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে হাসি-কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আব্বাজান প্রথমে আমাকে জানিয়েছেন 'মা আমার আর সময় নেই, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব'। আর দ্বিতীয়বার আমাকে জানিয়েছেন, 'পরিবারের সকলের মধ্যে আমিই তাঁর [মুহাম্মদ (স.)] সাথে প্রথমে মিলিত হবো।' হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে। এরপর তিনি যত দিন বেঁচে ছিলেন কখনো মুচকি হাসি হাসেননি।

স্বভাব – চরিত্র

হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সকল গুণই অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, লজ্জাশীল, পরোপকারিণী, ধৈর্যশীল ও আল্লাহর উপর অধিক আস্থাশীল। হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন, 'ফাতিমা আমার দেহের এক অংশ, যে তাঁকে নারাজ করবে, সে আমাকে নারাজ করবে।' (বুখারি)

তিনি আরও বলেন, 'ফাতিমা হলেন জান্নাতবাসী মহিলাদের নেত্রী।'(বুখারি)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি ফাতিমার তুলনায় স্পষ্টভাষী ও সত্যবাদী কাউকে দেখিনি। তবে তাঁর পিতার কথা স্বতন্ত্র।'(আল-ইস্তি'য়াব)

সন্তান-সন্ততি

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভে ৫ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন হযরত হাসান (রা.), হযরত হোসাইন (রা.), হযরত মুহসিন (রা.), হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) ও হযরত যয়নব (রা.)। হযরত মুহসিন (রা.) বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করেন।

ইন্তিকাল

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ফাতিমা (রা.) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। এগারো হিজরির তৃতীয় রমযান মঙ্গলবার তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। হযরত ফাতিমা (রা.)-কে

জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। সুন্দর চরিত্র, পিতৃভক্তি, অকৃত্রিম স্বামী সেবা, দানশীলতা ও লজ্জাশীলতা হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বিশ্ব নারী জাতির ইতিহাসে মহীয়সী করে রেখেছে।

দলগত কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলির তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ভাইয়ের নাম কী ?

ক. ইসমাঈল (আ.) খ. বিন ইয়ামিন (আ.)

গ. খালিদ বিন ওয়ালিদ (র) ঘ. ইউনুছ (আ.)

২. হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানির জন্য আল্লাহর নির্দেশ ছিল –

i. পিতা ইবরাহিম (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষা

ii. পুত্র ইসমাঈল (আ.)-এর আনুগত্য পরীক্ষা

iii. কুরবানি ওয়াজিব করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রবাসী জালাল মিয়া উদার হস্তে দান করেন এবং এলাকায় কয়েকটি মসজিদ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এতে এলাকার মোড়ল তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে একদল দুষ্কৃতিকারী লেলিয়ে দেয় এবং তারা তাকে অপমানিত করে। তারপরও জালাল মিয়া নিরুৎসাহিত না হয়ে তার জনকল্যাণমূলক কাজ অব্যাহত রাখেন।

১০৩৫

৩. জালাল মিয়ার কাজে মূলত কোন খলিফার চরিত্র ফুটে উঠেছে?

ক. হযরত আবু বকর (রা.)-এর খ. হযরত উমর (রা.)-এর

গ. হযরত উসমান (রা.)-এর ঘ. হযরত আলি (রা.)-এর

৪. জালাল মিয়ার কাজের ফলে –

i. আল্লাহ খুশী হন
ii. সমাজ উপকৃত হয়
iii. নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পাশাপাশি অবস্থিত দুই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সৃষ্টি হয়। বিবাদের চরম পর্যায়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের সেলিম মিয়ার মধ্যস্থতায় উভয় গ্রামের কয়েকজন প্রতিনিধিকে নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে একটি সমঝোতা চুক্তি করা হয়। এতে উভয় গ্রামের মানুষ নিশ্চিত সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পায়। চুক্তি সম্পাদনের পর সেলিম মিয়া সবার উদ্দেশ্যে বলেন, মহানবী (স:) এর জীবনী অনুসরণ করেই আমরা শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

(ক) হযরত ইসমাঈল (আ:) এর উপাধি কী ছিল?
(খ) মহানবী (স:) মদিনায় হিজরত করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
(গ) উদ্দীপকের সমঝোতা চুক্তিটি মহানবী (স:) এর কোন চুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) সেলিম মিয়ার শেষ উক্তিটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। প্রাচুর্য আর ধন-সম্পদ জাহিদ সাহেবকে অহংকারী করেনি, বরং তিনি খাঁটি মুমিন। মুমিন হওয়ার কারণে গ্রামের অন্যান্য লোকজন তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। তারপরও গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি খাদ্য বিতরণ করে সবাইকে সাহায্য করেন। গ্রামে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মারামারি বেঁধে গেলে জাহিদ সাহেব স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের সহযোগিতায় বিষয়টি মীমাংসা করেন এবং গ্রামবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, সমাজে আমরা সবাই ভাই ভাই হিসেবে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। এজন্য সবার প্রতি ক্ষমা, ভালবাসা ও দয়াশীল হতে হবে।

(ক) হযরত ফাতিমা (রা:) কী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন?

(খ) হযরত ইউসুফ (আ:) তাঁর ভাইদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) জাহিদ সাহেবের আচরণে তৃতীয় খলিফার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) জাহিদ সাহেবের সর্বশেষ উক্তিটি কোন খলিফার উক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৫

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম–ইসলাম শিক্ষা

অশান্তি যুদ্ধ হতেও গুরুতর।

– আল কুরআন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।